৪

অণুজীব

Microoorganisms

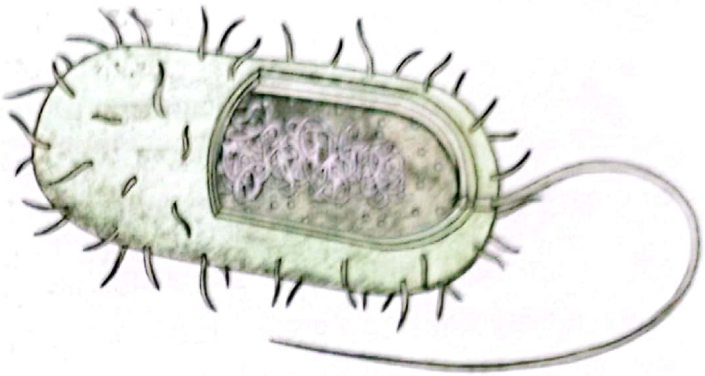

প্রধান প্রধান শব্দ

- অণুজীব
- ভাইরাস
- নিউক্লিওক্যাপসিড
- প্রিয়ন
- ভিরয়েড
- লাইসোজেনিক চক্র
- পরজীবী
- ব্যাকটেরিয়া
- প্লাজমোডিয়াম

লিউয়েনহুক (Leeuwenhoek, 1675) এর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার ও ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ মানুষের সামনে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে যেসব জীব দেখতে পাওয়া যায় না তাদেরকে **অণুজীব** (microbes) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতিকে অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জীববিজ্ঞানের অণুজীব সংশ্লিষ্ট শাখাকে **অণুজীববিজ্ঞান** (microbiology) বলে। আমাদের পরিবেশে বৈচিত্র্যময় অসংখ্য অণুজীব আছে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কল্যাণে আজ আমরা এ সকল অণুজীবের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন, প্রজনন, আচরণ সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। যে সকল অণুজীবের শনাক্তকরণে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োজন হয় সেসব জীবকে **অতি আণুবীক্ষণিক** বলে। যেমন— ভাইরাস। ২০২০ সাল শুরু হয় করোনা ভাইরাস (COVID-19) আতঙ্ক নিয়ে। এটিকে খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশে এ ভাইরাস দ্বারা রোগ ছড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্বে কয়েক লাখ মানুষ মারাও গেছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও গুরুত্ব
- ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সচিত্র জীবনচক্র
- ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়
- কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ
- ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন
- ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়
- ব্যবহারিক: ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন
- *Plasmodium vivax* (ম্যালেরিয়ার পরজীবী) এর জীবনচক্র
- মানবদেহে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর সংক্রমণ ও প্রতিকার

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	ভাইরাস: বৈশিষ্ট্য ও গঠন
পাঠ ২	ভাইরাসের গঠন : TMV ও ব্যাকটেরিওফায (T_2-ফায)
পাঠ ৩	ভাইরাসের গুরুত্ব
পাঠ ৪	ভাইরাসজনিত রোগ: পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক
পাঠ ৫ ও ৬	ভাইরাসজনিত রোগ: হেপাটাইটিস ও ডেঙ্গু জ্বর
পাঠ ৭ ও ৮	ব্যাকটেরিয়া: আবাস, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিন্যাস ও গঠন
পাঠ ৯	ব্যাকটেরিয়ার জনন
পাঠ ১০	ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব
পাঠ ১১	ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ: ধানের ব্লাইট বা ঝলসা
পাঠ ১২	ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ: কলেরা
পাঠ ১৩	ব্যবহারিক : ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ (দইয়ের নমুনা; টক দই)
পাঠ ১৪	ম্যালেরিয়ার পরজীবী: প্লাজমোডিয়াম
পাঠ ১৫	মশকীর দেহে প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্র

CamScanner

পাঠ ১

ভাইরাস : বৈশিষ্ট্য ও গঠন
Virus: Characteristics and Structure; Lt. *virus* = poison

৪.১ ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস হলো অতি আণুবীক্ষণিক এক প্রকার সত্তা যা ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় ১০-১০০ ভাগ ছোট এবং ব্যাকটেরিয়া রোধক ছাঁকনির মধ্য দিয়ে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। ভাইরাস হলো রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু। ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ **বিষ** (poison)। প্রাচীনকালে সাধারণের মধ্যে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সব রোগের কারণ বিষাক্ত পদার্থ। আর ভাইরাস শব্দ দিয়ে রোগ উৎপাদক সেই বিষাক্ত পদার্থগুলোকে বোঝানো হতো।

ভাইরাস হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত, অকোষীয়, অতি আণুবীক্ষণিক, বাধ্যতামূলক পরজীবী জৈবকণা যা শুধুমাত্র উপযুক্ত পোষককোষের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে ভাইরাসকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়- "ভাইরাস এমন এক সত্তা, যা জীবিত কোষের ভিতরে জীবিতের ন্যায় এবং এর বাইরে মৃত বস্তুর ন্যায় আচরণ করে (Virus is an entity which is living *in vitro* and non-living *in vivo*)"। [*in vitro*=জীবিত কোষের ভিতরে, *in vivo*=জীবিত কোষের বাইরে]

যদিও আদিকাল থেকে ভাইরাসজনিত রোগের সাথে আমাদের পরিচয় ছিল কিন্তু বিজ্ঞানী **Edward Jenner** ১৭৯৬ সালে প্রথম ভাইরাসঘটিত বসন্ত রোগের কথা উল্লেখ করেন। এরপর **এডলফ্ মায়ার** (A. Mayer, 1883) ভাইরাস সৃষ্ট মোজাইক রোগের ধারণা দেন। ১৮৯২ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী **ডিমিট্রি আইভানোভস্কি** (Dmitri Iwanowski) তামাকের মোজাইক রোগ নিয়ে গবেষণার পর মন্তব্য করেন যে, উক্ত রোগের সংক্রামক সত্তা ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্ষুদ্র এবং ভিন্ন কোনো অণুজীব কিন্তু কোনো ভাইরাস শনাক্ত করতে পারেননি। তবুও তাঁকেই ভাইরাসের আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারও পরে ১৮৯৮ সালে আরেক হল্যান্ড বিজ্ঞানী **Martinus Beijerinck** তামাকের মোজাইক রোগের ভাইরাসকে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV হিসেবে উল্লেখ করেন। **Walter Reed** ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম মানবদেহের **পীত জ্বর** (yellow fever) সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ সালে **ডাব্লিউ. এম. স্ট্যানলি** (W. M. Stanley) উক্ত রোগের জীবাণুকে পৃথক করে বিশুদ্ধ স্ফটিক তৈরি করেন। এ জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এরপর ১৯৩৭ সালে **এফ. সি. বাউডেন** (F. C. Bawden) এবং **এন. ডাব্লিউ. পিরি** (N. W. Pirie) ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, ভাইরাস শুধুমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ১৯৫১ সালে R.S. Shafferman এবং M.E. Morris নীলাভ-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া) ধ্বংসকারী ভাইরাস সায়ানোফায আবিষ্কার করেন। **গ্যালো** (Gallow) ১৯৮৪ সালে AIDS রোগের জীবাণু যে ভাইরাস তা আবিষ্কার করেন। ২০১৯ সালের শেষ দিকে নভেল করোনা ভাইরাস আবিষ্কার হয়।

৪.১.১ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Virus)

ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্য: ১. ভাইরাস অতি আণুবীক্ষণিক জৈবকণা অর্থাৎ অকোষীয় সত্তা। ২. পোষককোষের বাইরে এরা জড় বস্তুর মতো নিষ্ক্রিয় থাকে। ৩. ভাইরাসকে তাপ প্রয়োগ করে কেলাসে পরিণত করা যায়। ৪. ভাইরাসে কোনো বিপাকীয় এনজাইম নেই, তাই কোনো প্রকার বিপাক ক্রিয়া ঘটে না। ৫. এরা অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ প্রতিরোধে সক্ষম এবং অ্যান্টিবায়োটিক এদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। ৬. ভাইরাসের দৈহিক বৃদ্ধি নাই এবং উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। ৭. ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমাহার মাত্র। ৮. ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টারে ভাইরাস ফিল্টারযোগ্য নয়। ৯. সজীব কোষের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজননক্ষম নয়।

ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য: ১. ভাইরাসের দেহ প্রোটিন আবরণ ও জেনেটিক বস্তু DNA বা RNA নিয়ে গঠিত। ২. উপযুক্ত পোষককোষের অভ্যন্তরে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম। ৩. ভাইরাসে মিউটেশন (mutation) ঘটে এবং তার মাধ্যমে নতুন জাতের (strain) উদ্ভব হয়। ৪. কোনো কোনো ভাইরাসে জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে। ৫. সৃষ্ট অপত্য

CamScanner

ভাইরাসে মাতৃ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং একটি ভাইরাস থেকে অনুরূপ ভাইরাসের জন্ম হয়। ৬. এদের অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। ৭. এরা জীবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে ও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ৮. এরা সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী। ৯. এদের সুনির্দিষ্ট ধরন রয়েছে।

আবাসস্থল (Habitat): উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি জীবদেহের সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। আবার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি প্রায় সব জড় মাধ্যমে ভাইরাস অবস্থান করে। কাজেই বলা যায়, জীব ও জড় পরিবেশ উভয়ই ভাইরাসের আবাসস্থল। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে ১ চামচ সমুদ্রের পানিতে ১ মিলিয়ন ভাইরাস থাকে। ভাইরোলজি (virology) বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে ভাইরাসের আকার, গঠন, বংশবিস্তার, রোগতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। **W. M. Stanley-কে ভাইরোলজির জনক বলা হয়ে থাকে।**

আয়তন (Size): ভাইরাস অতি আণুবীক্ষণিক এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে দেখা যায় না। ভাইরাসের গড় ব্যাস ৮–৩০০ nm (ন্যানোমিটার)। ভাইরাস সাধারণত ১২ nm (যেমন– পোলিও ভাইরাস) হতে ৩০০ nm (যেমন– তামাকের মোজাইক ভাইরাস) পর্যন্ত হয়ে থাকে। গবাদি পশুর **ফুট অ্যান্ড মাউথ** রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্র (৮-১২ nm)। **ভ্যাকসিনিয়া ও ভিরিওলা** ভাইরাস বেশ বড়, ২৮০-৩০০ nm পর্যন্ত হয়। গোলআলুর মোজাইক ভাইরাস, গো-বসন্তের ভাইরাস আরও বৃহদাকৃতির হয়।

আকৃতি (Shape): ভাইরাস সাধারণত বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন- দণ্ডাকার, বর্তুলাকার, ব্যাঙাচি আকার, সূত্রাকার, গোলাকার, ডিম্বাকার, পাউরুটি আকার, বহুভুজাকৃতি প্রভৃতি।

প্রকৃতি (Nature): অণুজীব বিজ্ঞানীদের কাছে ভাইরাসের প্রকৃতি এখনও রহস্যময়। কারণ ভাইরাসে কখনও জড় রাসায়নিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, আবার কখনও সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। ১৯৫২ সালে বিজ্ঞানী **Lwoff** মন্তব্য করেন- **ভাইরাস জীবও নয় জড় বস্তুও নয়, ভাইরাস ভাইরাসই।** নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, ভাইরাস জীব ও জড়বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের একটি বস্তু। ভাইরাস যেহেতু অকোষীয়, এদের বৃদ্ধি ও বিকাশ নেই, সজীব কোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক কণা তাই এরা জড় প্রকৃতির। আবার পোষককোষের অভ্যন্তরে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে, ভাইরাসে বংশগতীয় বস্তু DNA বা RNA উপস্থিত, এদের মিউটেশন ঘটে। অর্থাৎ এরা সজীব প্রকৃতির। তাই ভাইরাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে একে জীব ও জড় এর যোগসূত্র বলা যায়।

৪.১.২ ভাইরাসের গঠন (Structure of Virus)

প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস রয়েছে। একটি আদর্শ ভাইরাসের গঠন বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়—

- **ক্যাপসিড (Capsid):** ভাইরাসের প্রোটিনঘটিত আবরণকে ক্যাপসিড বলে। প্রতিটি ক্যাপসিড ক্যাপসোমিয়ার (capsomere) নামক অনেকগুলো গাঠনিক এককের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি ভিরিয়নে সর্বোচ্চ ২০০০ হতে ২১৩০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে। ক্যাপসোমিয়ারগুলোর বিন্যাসের ভিত্তিতে ভাইরাস ক্যাপসিড বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। ক্ষেত্র বিশেষে ক্যাপসিডে প্রোটিনের সাথে লিপিড ও স্টার্চ থাকে। ক্যাপসিড ভেতরের বস্তুকে (DNA বা RNA) সুরক্ষা করে এবং অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে।
- **আবরণ (Envelop):** কোনো কোনো ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে লিপিডঘটিত অতিরিক্ত একটি আবরণ থাকে। এমন ভাইরাসকে **লিপোভাইরাস** (lipovirus) বলে; যেমন– HIV। আবরণের গঠনগত এককগুলোকে **পেপলোমিয়ার** (peplomere) বলে। আবরণবিহীন ভাইরাসকে **নগ্ন ভাইরাস** বলে। আবরণের বহিঃপৃষ্ঠ মসৃণ অথবা স্পাইক (কাঁটা) যুক্ত হতে পারে। তবে প্রজাতিভেদে স্পাইকের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং এগুলো **গ্লাইকোপ্রোটিন** দিয়ে গঠিত। কোনো কোনো ভাইরাসে স্পাইকগুলো হিমোলাইসিস, হিমাগ্লুটিন্যাটিং ক্রিয়া করে থাকে।

- **নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid):** ভাইরাসে ক্যাপসিডের ভেতরের অংশকে মজ্জা (Core) বলে যা শুধুমাত্র যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। উদ্ভিদ ভাইরাসে সাধারণত এক সূত্রক RNA (TMV) এবং ফায ও প্রাণী ভাইরাসে সাধারণত দ্বিসূত্রক DNA থাকে। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে দ্বিসূত্রক RNA (reovirus) এবং এক সূত্রক DNA (কোলিফাজ) থাকে। ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড এক বা একাধিক (HIV) টুকরা নিয়ে গঠিত। আবৃত ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ গঠন তৈরি করে যাকে **নিউক্লিওক্যাপসিড** (nucleocapsid) বলে। যেমন– HIV।

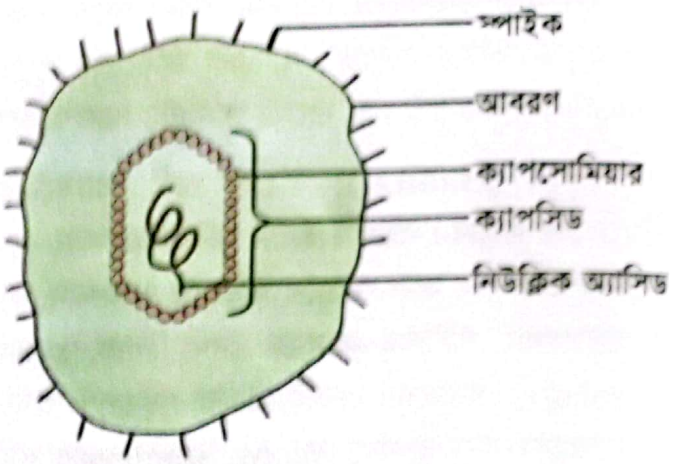

চিত্র-৪.১: ভাইরাসের সাধারণ গঠন

অন্তদ্রব্য (Inner Substance): কোনো কোনো ভাইরাসে লিপিড, পলিস্যাকারাইড, তামা, বায়োটিন এবং এনজাইম থাকে। যেমন- ব্যাকটেরিওফাযে লাইসোজাইম, আবার HIV-তে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইম থাকে। তাই এরা RNA থেকে DNA সংশ্লেষ করতে পারে (রিট্রোভাইরাস)।

৪.১.৩ ভাইরাসের প্রকারভেদ (Types of Virus)

গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাইরাসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়—

১. **আকৃতি অনুযায়ী:** ভাইরাসকে আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. **গোলাকার (Spherical):** এরা দেখতে অনেকটা গোলাকার। উদাহরণ- পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেঙ্গু ভাইরাস।

ii. **ডিম্বাকার (Oval Shaped):** এই ধরনের ভাইরাসগুলো অনেকটা ডিম্বাকার। উদাহরণ- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

iii. **দণ্ডাকার (Rod Shaped):** এরা দেখতে অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ- আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV)।

জেনে রাখো

ভিরিয়ন: নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন বলে। সংক্রমন ক্ষমতা বিহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিওক্যাপসিড।

চিত্র-৪.২: বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস

iv. **সিলিন্ড্রিক্যাল (Cylindrical Shaped):** আকারের দিক থেকে এরা সিলিন্ডারের মতো। যেমন- Ebola virus ও মেইজ স্ট্রিক ভাইরাস।

v. **ঘনক্ষেত্রাকার/ বহুভুজাকার (Cubical/ Polygonal):** এই ধরনের ভাইরাস দেখতে অনেকাংশে পাউরুটির মতো। যেমন- হার্পিস, ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস।

vi. **ব্যাঙাচি আকার (Tadpole Shaped):** এ ধরনের ভাইরাস মাথা ও লেজ– এ দুই অংশে বিভক্ত। উদাহরণ– T_2, T_4, T_6 ইত্যাদি।

২. **নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী:** ভাইরাসকে নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) DNA ভাইরাস এবং (ii) RNA ভাইরাস।

(i) **DNA ভাইরাস:** নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে যে ভাইরাসে DNA থাকে তাদেরকে DNA ভাইরাস বলা হয়। উদাহরণ- T_2 ভাইরাস, ভ্যাক্সিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridescent Virus), অ্যাডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস। Parvoviridae গোত্রের (ϕX_{174} ও M_{13}কোলিফাজ) ভাইরাসের DNA একসূত্রক।

(ii) **RNA ভাইরাস:** নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে যে ভাইরাসে RNA থাকে তাদেরকে বলা হয় RNA ভাইরাস। উদাহরণ- TMV, HIV, ডেঙ্গু, পোলিও, মাম্পস, রেবিস ইত্যাদি ভাইরাস। Reoviridae গোত্রের (রিওভাইরাস, ধানের বামন রোগের ভাইরাস) ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।

৩. **বহিঃস্থ আবরণ অনুযায়ী:** বহিঃস্থ আবরণ অনুযায়ী ভাইরাস দুই ধরনের। যথা- (i) বহিঃস্থ আবরণহীন ভাইরাস; যেমন- TMV, T_2 ভাইরাস; (ii) বহিঃস্থ আবরণী ভাইরাস; যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস, HIV ভাইরাস।

৪. **পোষকদেহ অনুযায়ী:** পোষকদেহের উপর ভিত্তি করে ভাইরাস বেশ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে-

(i) **উদ্ভিদ ভাইরাস:** উদ্ভিদ ভাইরাস উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে। যেমন- TMV, Bean Yellow Virus (BYV)।

(ii) **প্রাণী ভাইরাস:** যে সকল ভাইরাস প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে প্রাণী ভাইরাস বলে। যেমন- HIV, ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস, নভেল করোনা ভাইরাস।

(iii) **ব্যাকটেরিওফায:** ভাইরাস যখন ব্যাকটেরিয়ার উপর পরজীবী হয় এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তখন তাকে ব্যাকটেরিওফায বলে। যেমন- T_2, T_4, T_6 ব্যাকটেরিওফায।

(iv) **সায়ানোফায:** সায়ানোব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে সায়ানোফায বলে। যেমন- LPP_1, LPP_2, (*Lyngbya*, *Plectonema* ও *Phormidium* নামক সায়ানোব্যাকটেরিয়ার প্রথম অক্ষর দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে।)

৫. **পোষকদেহে কীভাবে সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি করে তার উপর ভিত্তি করেও** ভাগ করা হয়। যেমন- সাধারণ ভাইরাস ও রিট্রোভাইরাস। HIV একটি রিট্রোভাইরাস। এখানে ভাইরাস RNA থেকে DNA তৈরি হয়।

৬. **অন্যান্য ধরন:** যেসব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে থাকে তাদের মাইকোফায (mycophage) বলে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে Holmes ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phaginae, উদ্ভিদ আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phytophaginae এবং প্রাণী আক্রমণকারী ভাইরাসকে Zoophaginae নামকরণ করেন।

ভাইরাসের পরজীবিতা (Parasitism of Virus)

পরজীবী হিসেবে বেঁচে থাকার চরিত্রকে পরজীবিতা বলে। সকল ভাইরাস বাধ্যতামূলক পরজীবী (obligate parasite) এবং তাদের পোষক পরিসর সুনির্দিষ্ট (host specific)। যেমন- TMV শুধুমাত্র তামাক গাছ এবং T_2-ফায় শুধুমাত্র *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে থাকে।

ইমারজিং ভাইরাস (Emerging Virus): ভাইরাসের পোষক পরিসর সুনির্দিষ্ট হলেও কোনো কোনো ভাইরাস তার স্বাভাবিক পোষক নয় এমন প্রাণিদেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এমন চরিত্রের ভাইরাসকে **ইমারজিং ভাইরাস** বলে। যেমন– HIV এর আদি পোষক বানর এবং সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস (H_1N_1) এর আদি পোষক পাখি হলেও তা ইদানিং মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করছে। ১৯১৮-১৯১৯ সালে ফ্লু জনিত কারণে প্রায় ২.১ কোটি মানুষ মারা যায়। এছাড়া SARS, Ebola, Nile virus, Corona virus এ জাতীয়।

ইবোলা ভাইরাস (Ebola Virus): ইবোলা ভাইরাস এক সূত্রক RNA নিয়ে গঠিত। ইবোলা নামক ভাইরাসের আক্রমণে ইবোলা রোগ হয়। ১৯৭৬ সালে কঙ্গোর ইবোলা নদীর তীরে প্রথম এ রোগে একজন কৃষক মারা যায়। এ রোগে মানুষের কোষ ফেটে যায় এবং ব্যাপক রক্তক্ষরণ ঘটে। তাই ইবোলা একটি মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ। সংস্পর্শের

CamScanner

মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায় এবং ২-২১ দিনের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ২০১৪-২০১৫ সালে আফ্রিকান দেশ গিনি, সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়াসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। এ সময় ২৫০ জন স্বাস্থ্য কর্মীসহ প্রায় ১১,০০০ হাজার লোক মারা যায়।

জিকা ভাইরাস (Zika Virus): জিকা এক প্রকার RNA ভাইরাস যা ১৯৫২ সালে বানরের রক্ত এবং ১৯৫৪ সালে নাইজেরিয়ায় মানুষের দেহ হতে পৃথক করা হয়। ১৯৪৭ সালে প্রথম উগান্ডার **Zika forest**-এ বসবাসকারী রেসাস বানরের দেহে এ ভাইরাস পাওয়া যায়। উগান্ডা ভাষায় *zika* অর্থ Overgrown। এ ভাইরাস সংক্রমণে মস্তিষ্কের অপরিণত বৃদ্ধি ঘটে এবং শিশুর মাথা আকারে ছোট হয়। ডাক্তারি ভাষায় এ ত্রুটিকে **মাইক্রোসেফালি** বলে। জিকা ভাইরাসের একমাত্র বাহক হলো *Ades* জাতীয় মশা।

ভিরয়েডস (Viroids): ভিরয়েডস হলো এক সূত্রক বৃত্তাকার RNA যা মাত্র কয়েকশ নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত। এগুলো শুধুমাত্র কতিপয় উদ্ভিদে পাওয়া যায়। ভিরয়েডস এর কারণে নারিকেল গাছে ক্যাডাং ক্যাডাং রোগ হয়।

প্রিয়নস (Prions): প্রোটিনের ক্ষুদ্রাকার ও সংক্রামক কণাকে প্রিয়ন বলে। প্রিয়ন শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রকার প্রাণিদেহে পাওয়া যায় ও সেখানে স্নায়ুতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে। মানুষের কুরু (kuru) রোগ, গরুর ম্যাড কাউ (Mad Cow) রোগ, ভেড়া ও ছাগলের স্ক্র্যাপি (scrapie) প্রিয়নের কারণে হয়ে থাকে।

নিপা ভাইরাস (Nipah Virus): এটি Paramyxoviridae পরিবারভুক্ত RNA ভাইরাস। ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ার শূকরের খামারে এ ভাইরাস পাওয়া যায়। বাদুড় এই ভাইরাসের বাহক, তাই কাঁচা খেজুর রসের মাধ্যমে এ ভাইরাস মানবদেহে অনুপ্রবেশ করে।

চিকুনগুনিয়া (Chikungunya): এটি এক প্রকার RNA ভাইরাসজনিত জ্বর। এ ভাইরাস আলফা গোত্রভুক্ত। *Aedes aegypti* এবং *A. albopictus* মশকী দ্বারা এই ভাইরাস ছড়ায়। ২০১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। প্রচণ্ড জ্বর, গিটে গিটে ব্যথা, শরীরে র‍্যাশ ওঠা, মাথাব্যথা, দুর্বলতা প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ। অনেকের জ্বর কমে গেলেও ব্যথা ৩-৪ মাস থাকতে পারে। ব্যক্তিগত সচেতনতাই এ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

করোনা ভাইরাস (COVID-19): এটা Corona গ্রুপের একটি RNA ভাইরাস। আকৃতি গোলাকার থেকে বহুরূপী এবং লিপিডের আবরণে আবৃত। মনে করা হয় বাদুড় থেকে অন্যকোনো মাধ্যম হয়ে মানুষে পরজীবিত্ব লাভ করেছে। ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এবং পরবর্তীতে ঐ শহরসহ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। খুব দ্রুত বিশ্বের প্রায় ২০০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে এটা প্যানডেমিক রূপ ধারণ করে। বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ই মার্চ প্রথম এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। ২০২২ সালের ৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে ৬৪,৯৬,৮৯,৯০৭-এর অধিক মানুষ আক্রান্ত হয় এবং ৬৬,৪৫,৮০৩-এর কাছাকাছি মানুষ মারা যায়। এসময়ে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ১১ লক্ষ ৬ হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশে একই সময়ে ২০,৩৬,৬২২ জন মানুষ আক্রান্ত হয় এবং ২৯,৪৩৪ এর অধিক মানুষ মারা যায়। এ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগে সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, ডায়রিয়া, ঘ্রাণশক্তি কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের মারাত্মক পর্যায়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শিশু, বৃদ্ধ ও যাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল তাদের নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস হয়। এ রোগে মৃত্যুর হার খুব কম (২-৩%), তবে খুব দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করে।

হাঁচি, কাশি, বাতাস, সংস্পর্শ ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি ছড়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে এ রোগের কয়েকটি ভ্যাক্সিন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এবং তা মানবদেহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে এ রোগ প্রতিরোধে বার বার সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, মুখ, নাক, চোখে হাত না দেয়া, ফ্লু আক্রান্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলা, ব্যক্তিগত বা পরিবারভিত্তিক সঙ্গনিরোধ, মুখে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত।

একক কাজ

ভাইরাসের জড় ও জীবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

CamScanner

পাঠ ২

ভাইরাসের গঠন : TMV ও ব্যাকটেরিওফায (T_2-ফায)
Structure of Virus : TMV and Bacteriophage (T_2-phage)

৪.২ টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV (Tobacco Mosaic Virus)

এরা দৃঢ় দণ্ডাকৃতির ভাইরাস। তামাক গাছে এরা মোজাইক রোগ তৈরি করে। TMV এর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ হলো ২৮০ nm–৩০০ nm এবং প্রস্থের পরিমাপ হলো ১৫ nm–১৮ nm। TMV গঠিত হয় RNA এবং প্রোটিন সমন্বয়ে। বাইরে একটি পুরু প্রোটিন আবরণ থাকে। এই প্রোটিন আবরণকে ক্যাপসিড বলে। ক্যাপসিড ২১৩০-২২০০টি ক্যাপসোমিয়ার নামক উপএকক দ্বারা গঠিত। ক্যাপসোমিয়ার কতগুলো আঙ্গুরের থোকার ন্যায় পরস্পর সজ্জিত থাকে। সাধারণত প্রতিটি ক্যাপসোমিয়ারে ১৫৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। একসূত্রক RNA কোর (core) ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে প্যাঁচানো অবস্থায় দেখা যায়। RNA সূত্রটি ৬৫০০টি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। ভাইরাসের প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন (ওজনের দিক থেকে)। TMV এর আণবিক ওজন ৩৭ মিলিয়ন ডাল্টন এবং RNA এর আণবিক ওজন ২.৪ মিলিয়ন ডাল্টন। প্রত্যেকটি প্রোটিন সাবইউনিটের আণবিক ওজন ১৭০০০ ডাল্টন।

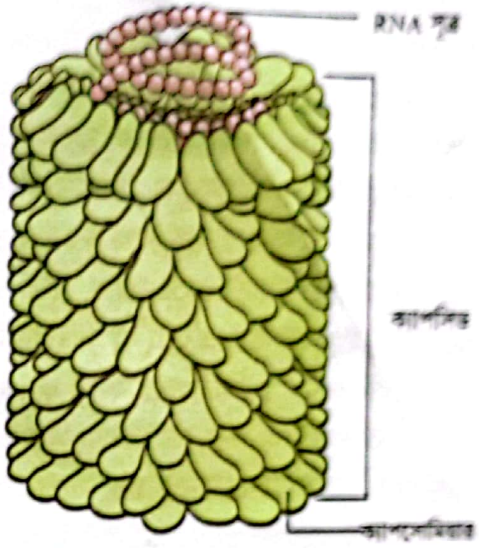

চিত্র-৪.৩ : TMV ভাইরাস

৪.৩ ব্যাকটেরিওফায: T_2-ফায (Bacteriophage: T_2-phage)

ফায (Phage) শব্দটির বাংলা অর্থ ভক্ষণ করা। এটি মূলত একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো 'to eat'। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐ সকল ভাইরাস যারা ব্যাকটেরিয়ার দেহাভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে এবং ঐ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। সহজভাবে বলা যায়, যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বা ফায বলে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **দ্য হেরেলি ফেলিক্স** (d' Herelle Felix) এ ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায নামে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানী Twort **ব্যাকটেরিওফায** তথা T_2-ফায আবিষ্কার করেন।

৪.৩.১ T_2-ফায এর গঠন (Structure of T_2-phage)

T_2-ফায একটি ব্যাঙাচি আকৃতির ভাইরাস। এর দেহ মাথা এবং লেজ নিয়ে গঠিত।

মাথা: T_2-ফায়ের মাথাটি প্রশস্ত এবং ষড়ভুজাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৯৩-১০০nm এবং ৬৫ nm। মাথার আবরণটি প্রোটিনের ক্যাপসিড যা প্রায় ২০০০ ক্যাপসোমিয়ার দিয়ে গঠিত এবং এর ভিতরে ৫০ μm দীর্ঘ একটি DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড দিয়ে এই DNA গঠিত। T_2-ফায়ের DNA দ্বিসূত্রক এবং মোট ওজনের ৫০%। এতে ১৫০টি জিন থাকে।

লেজ: মাথার নিচে একটি সরু ও দীর্ঘ ফাঁপা নলাকার লেজ থাকে। লেজটি দৃঢ় এবং তা স্প্রিং এর মতো প্যাঁচানো সংকোচনশীল আবরণে আবৃত থাকে। লেজটির দৈর্ঘ্য ৯৫-১০০ nm এবং প্রস্থ ১৫-২৫ nm। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেজের বাইরে আবরণ থাকে না।

লেজ ও মাথার সংযোগস্থলে চাকতির মতো একটি কলার থাকে। লেজের শেষ প্রান্তে কয়েকটি স্পাইকযুক্ত একটি ষড়ভুজাকার বেসপ্লেট থাকে। এ বেসপ্লেটের সাথে ৬টি স্পর্শক তন্তু সংযুক্ত থাকে।

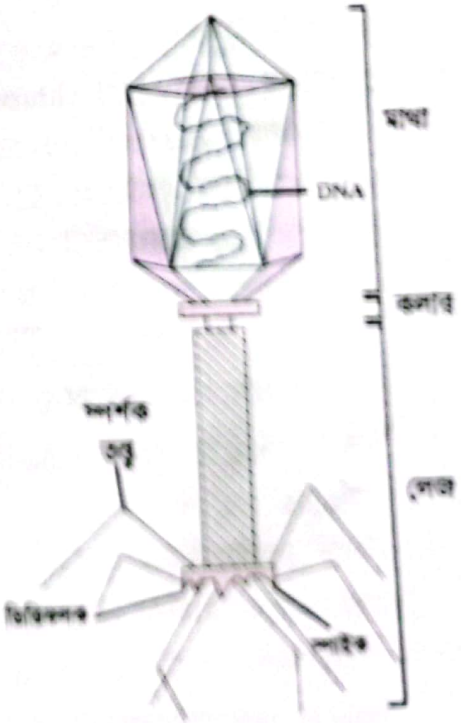

চিত্র-৪.৪: T_2-ফায ভাইরাস

T_2-ফাযের মাথার ক্যাপসিড, কলার এবং লেজের সকল অংশ প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তবে T_2-ফাযের লেজে লাইসোজাইম নামক এনজাইম থাকে। T_2-ফাযে কোনো নিউক্লিয়াস, কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম, কোষ প্রাচীর এমনকি কোনো কোষ অঙ্গাণুও দেখা যায় না।

৪.৩.২ T_2-ফায এর সংখ্যাবৃদ্ধি (Replication of T_2-Phage)

অন্যান্য জীব বা অণুজীবের মতো পূর্বসৃষ্ট সত্তা (pre-existing) থেকে ভাইরাস সৃষ্টি হয় না বরং পোষকদেহের রাসায়নিক দ্রব্যও এখানে জড়িত থাকে। তাই জড়বস্তুর মতো ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি পদ্ধতিকে **অনুলিপন বা রেপ্লিকেশন** শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্যাকটেরিওফায-এর সংখ্যাবৃদ্ধি দু'ভাবে ঘটে থাকে, যথা- **(ক) লাইটিক চক্র বা ভাইরুলেন্ট চক্র** এবং **(খ) লাইসোজেনিক চক্র বা টেমপারেট দশা**। T-সিরিজভুক্ত ফাযে অর্থাৎ T_2, T_4, T_6 ইত্যাদিতে লাইটিক চক্র ঘটে এবং ল্যামডা ফায (λ-phage)- এ লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন হয়। নিচে এ দু'ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো–

(ক) লাইটিক চক্র (Lytic Cycle): যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো পোষকদেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তাকে **লাইটিক চক্র বা বিগলনকারী চক্র** বলে। লাইটিক চক্রের মাধ্যমে মাত্র ৩০ মিনিটে প্রায় ৩০০টি নতুন অপত্য ফায সৃষ্টি হয়ে থাকে। *Escherichia coli* (*E. coli*) নামক ব্যাকটেরিয়া কোষে T_2 ব্যাকটেরিওফাযের লাইটিক চক্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ সংঘটিত হয়।

ধাপ-১: পৃষ্ঠলগ্ন হওয়া (Attachment/ Landing): T_2-ফায *Escherichia coli* (পোষক) ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শক তন্তু এবং স্পাইকের সাহায্যে প্রথমে পৃষ্ঠলগ্ন হয়। T_2-ফাযের ক্ষেত্রে পোষক কোষ প্রাচীরের লিপোপ্রোটিন গ্রাহীস্থান (receptor site) হিসেবে ব্যবহার হয়।

ধাপ-২: ফায DNA অনুপ্রবেশ (Penetration): পৃষ্ঠলগ্ন হওয়ার পর স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে ভাইরাস তার দেহটিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের যথাস্থানে আবদ্ধ করে এবং লাইসোজাইম এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি করে। ফায লেজের প্রোটিন আবরণকে সংকুচিত করে প্রোটিনের লেজটিকে

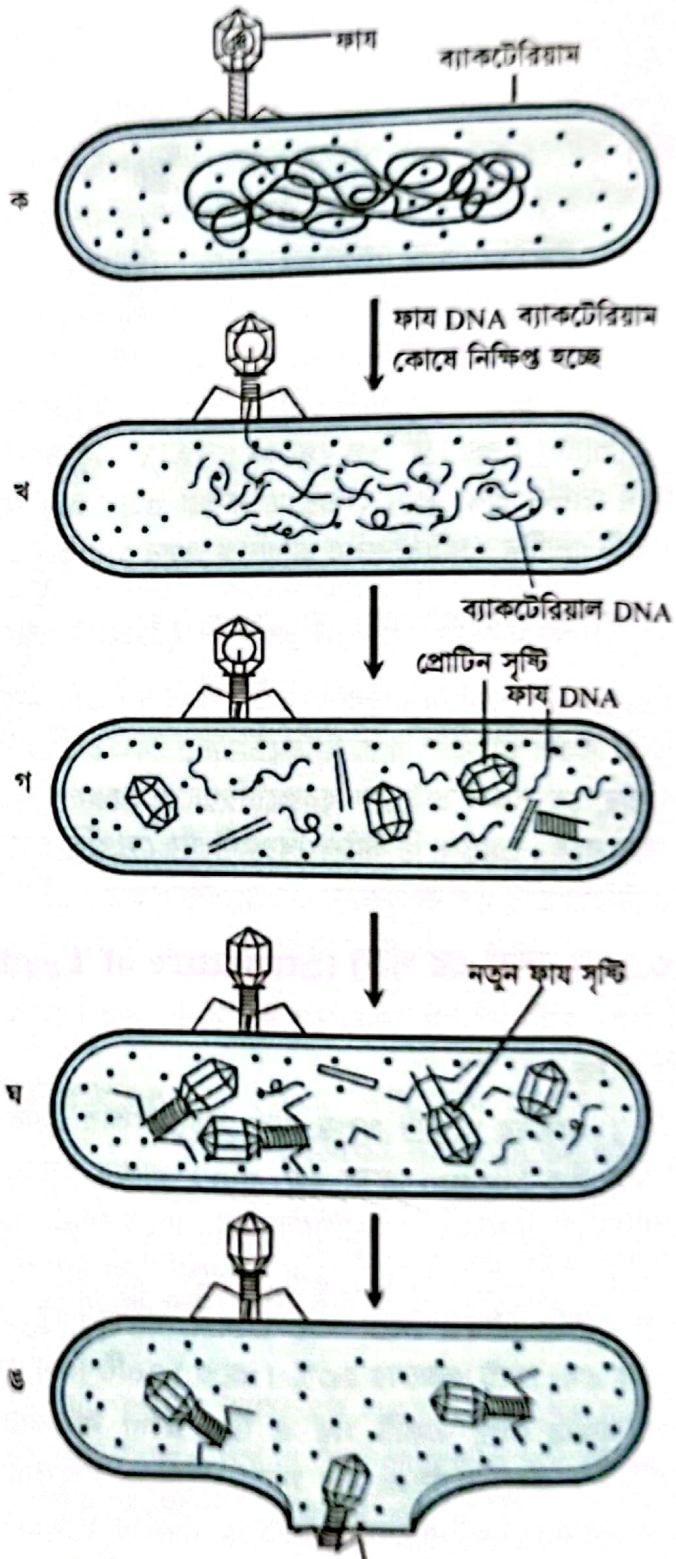

ব্যাকটেরিয়াম কোষের প্রাচীর ফেটে গিয়ে নতুন ফায বের হয়ে আসছে

চিত্র-৪.৫: T_2-ফাযের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া
ক. পৃষ্ঠ লগ্ন হওয়া, খ. অনুপ্রবেশ, গ. ফাযের অঙ্গ উৎপাদন, ঘ. পূর্ণাঙ্গ T_2-ফায গঠন ও ঙ. লাইসিস

CamScanner

কোষ প্রাচীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং শুধুমাত্র DNA কে ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করায়। এ অবস্থায় ফাযের সম্পূর্ণ ক্যাপসিড (প্রোটিন আবরণ) ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরে থাকে। যাকে ghost বা doughnut বলে।

ধাপ-৩: **অনুলিপন (Replication):** অনুপ্রবেশের পর ১২-২২ মিনিট সময় পর্যন্ত ভাইরাসের DNA-কে পোষক কোষে দেখা যায় না। এখানে ফায DNA পোষক কোষের ক্রোমাটিন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পোষকের বংশগতীয় ক্রিয়াকলাপ নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং নিজের ইচ্ছা মতো ফায DNA তৈরি করতে থাকে। ব্যাকটেরিয়ার এনজাইম সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে ফায DNA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ফায DNA এক ধরনের প্রাক প্রোটিন (এনজাইম) সৃষ্টি করে যা ব্যাকটেরিয়ার DNA-কে ভেঙে টুকরা টুকরা করে দেয় এবং ফায DNA রেপ্লিকেশন করে। কোষের কেন্দ্রাংশ বরাবর পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিওটাইড ব্যবহার করে নতুন ফায DNA-র অনুলিপি তৈরি হয়। নতুন ফায DNA দ্বারা সৃষ্ট বিলম্ব প্রোটিন (এনজাইম) ফাযের ইচ্ছাধীন নির্দেশ মতো উপাদানসমূহ সৃষ্টি করে। নতুন ফায DNA থেকে যে mRNA তৈরি হয় তা পোষক কোষের রাইবোজোমীয় ফ্যাক্টরিতে (ফাযের জন্যে) প্রোটিনের খোলস তৈরি হতে থাকে।

ধাপ-৪: **বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া (Assemble):** প্রোটিন খোলস (মাথা) তৈরির পর এক কপি DNA অণু প্রোটিন খোলসে প্রবেশ করে। এরপর লেজ, স্পর্শক তন্তু প্রভৃতি সংযুক্ত হয়ে নতুন ভিরিয়ন কণা গঠিত হয়। শেষে লাইসোজাইম এর সংশ্লেষ ঘটে এবং নতুন কার্যকর T_2-ফায গঠন করে। এভাবে প্রতি কোষে ১০০-৩০০ T_2-ফায তৈরি হয়। এ পর্যায়ে পোষক কোষ গোলাকার হয়ে যায়।

ধাপ-৫: **নতুন ভাইরাস মুক্তি (Release):** লাইসোজাইম এনজাইমের অনুরূপ কোনো পদার্থ পোষক কোষ হতে সৃষ্টি হওয়ার কারণেই পোষক কোষ প্রাচীরের মিউকোপেপটাইড জাতীয় যৌগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কোষ প্রাচীর দুর্বল ও বিদীর্ণ হয় এবং অপত্য T_2-ফায বাইরে নির্গত হয়। ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীর ধ্বংস হওয়াকে লাইসিস (lysis) বলে।

T_2-ফায ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপগুলো সম্পন্ন হতে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট সময় লাগে। পোষক ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার পর থেকে পূর্ণাঙ্গ অপত্য ভাইরাস সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত সময় কালকে **ইকলিপস** (eclipse) বলে।

(খ) লাইসোজেনিক চক্র (Lysogenic Cycle): যে চক্রে কেবলমাত্র ভাইরাল DNA ও ব্যাকটেরিয়াল DNA-র মধ্যে সমন্বয় ঘটে এবং তার প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কোনো ভাইরাস সৃষ্টি হয় না বা ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরেরও বিগলন ঘটে না সেই চক্রকে **লাইসোজেনিক চক্র** বলে। যেমন- *E. coli* আক্রমণকারী ল্যামডা-ফায (λ-phage)-এ লাইসোজেনিক চক্র দেখা যায়। এমন ফাযকে **লাইসোজেনিক ফায** (lysogenic phage) বা **টেমপারেট ফায** (temperate phage) বলে। তবে যেকোনো সময় লাইসোজেনিক পর্যায় থেকে এটি পুনরায় লাইটিক পর্যায়ে চলে যেতে পারে এবং পোষক কোষ ধ্বংস করে বাইরে বেরিয়ে আসে। এ ধরনের চক্রে ফায ভাইরাস পোষক কোষকে ধ্বংস না করেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। লাইসোজেনিক চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. **পোষক ব্যাকটেরিয়ায় সংযুক্তি এবং ফায DNA এর অনুপ্রবেশ:** লাইটিক চক্রের মতোই প্রথমে ফায ভাইরাস পোষক কোষে সংযুক্ত হয়। পরে পোষক কোষ প্রাচীরকে ছিদ্র করে DNA অণুকে পোষক কোষে প্রবিষ্ট করায় এবং শূন্য প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরে থেকে যায়।

২. **ব্যাকটেরিয়া DNA এর সঙ্গে ভাইরাস DNA এর সংযুক্তি:** এ পর্যায়ে **নিউক্লিয়েজ** এনজাইম ব্যাকটেরিয়ার DNA -কে একটি জায়গায় কেটে ফেলে। এই কাটা স্থানে ফায DNA-টি গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ ধরনের সংযুক্তিতে **ইন্টিগ্রেজ** এনজাইম বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর সঙ্গে সংযুক্ত ভাইরাস DNA-টিকে **প্রোফায** (prophage) বলে। এটি ব্যাকটেরিয়ায় সুপ্তাবস্থায় থাকে। ফায DNA-সহ *Escherichia coli* (*E. coli*) ব্যাকটেরিয়া দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জিনোম

একসাথে একটি নতুন জিনোম তৈরি করে। প্রত্যেকবার সংখ্যাবৃদ্ধির সময় ব্যাকটেরিয়াল DNA এর অনুরূপ ভাইরাল DNA অণুটির প্রতিলিপি গঠিত হতে থাকে। এভাবে প্রতিটি অপত্য ব্যাকটেরিয়ায় ভাইরাল DNA-র একটি কপি সংযুক্ত হতে থাকে।

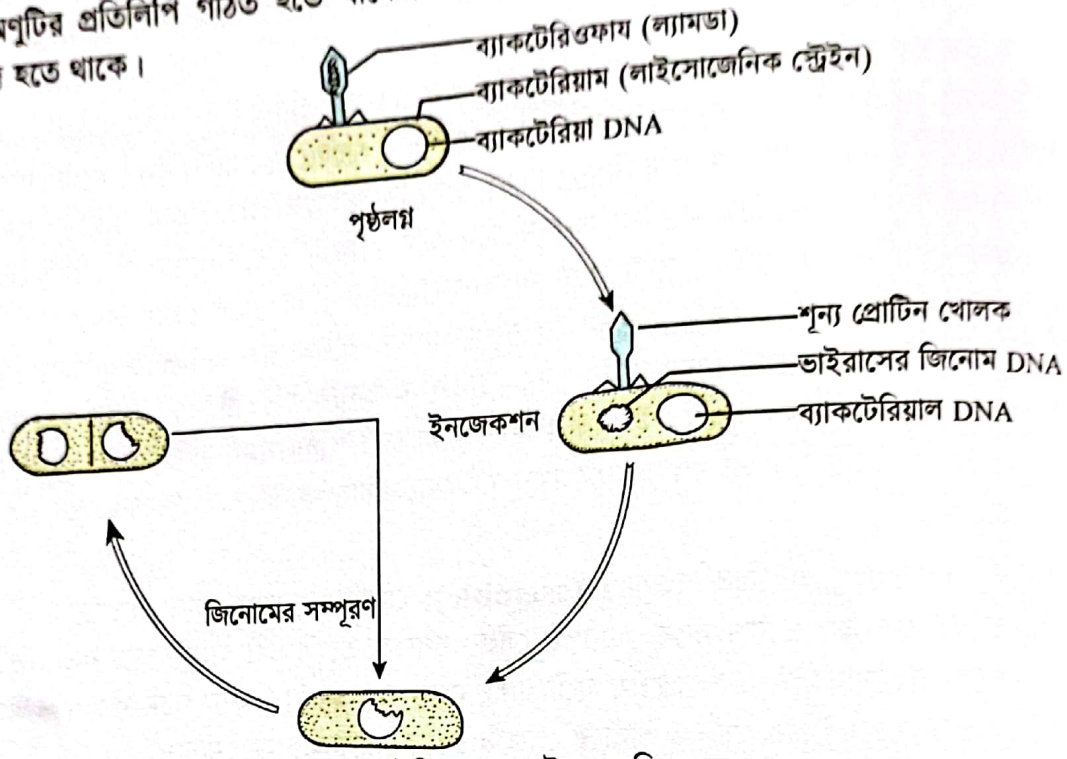

চিত্র-৪.৬: ল্যামডা (λ) ব্যাকটেরিওফাযে লাইসোজেনিক চক্র

অনেক সময় পোষক DNA থেকে ফায DNA পৃথক হয়ে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। লাইসোজেনিক ভাইরাস কেবলমাত্র Bacteriophage-এ সীমাবদ্ধ না, মানুষ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকেও আক্রমণ করতে পারে। *Herpes simplex* এমনই একটি ভাইরাস।

শ্রেণির কাজ

ব্যাকটেরিওফাযের সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়টির রেখাচিত্র অঙ্কন করো এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৩

ভাইরাসের গুরুত্ব
Importance of Virus

৪.৪ ভাইরাসের গুরুত্ব (Importance of Virus)

ভাইরাসের গুরুত্বে অপকারি ও উপকারি দুটি দিকই রয়েছে। নিচে ভাইরাসের গুরুত্বে এ দুটি দিক উল্লেখ করা হলো—

ভাইরাসের অপকারিতা

১. **মানুষের রোগ:** বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস মানুষের দেহে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- বসন্ত, হাম, পোলিও, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, কোভিড-১৯, ডেঙ্গু, হেপাটাইটিস, চিকুনগুনিয়া ইত্যাদি।

২. **উদ্ভিদের রোগ:** ভাইরাস বিভিন্ন প্রকার ফসলি উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে শস্যের ফলন কমিয়ে দেয় অথবা ফসলহানী ঘটায়। যেমন- আলুর লিফরোল, ধানের টুংরো, শিমের মোজাইক, পেঁপে ও টমেটোর লিফকার্ল রোগসহ প্রায় ৩০০ প্রকারের উদ্ভিদরোগ ভাইরাসের কারণে হয়।

৩. **গৃহপালিত পশুর রোগ:** বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস গৃহপালিত পশুর দেহে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- গরুর বসন্ত, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার পা ও মুখের ক্ষত রোগ (foot & mouth disease), কুকুর ও বিড়ালের জলাতঙ্ক রোগ ইত্যাদি।

CamScanner

৪. **হাঁস-মুরগির রোগ:** হাঁস-মুরগি এমনকি পরিযায়ী পাখি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হাঁস-মুরগির খামারে অনেক সময় বার্ড ফ্লু ও সোয়াইন ফ্লু নামক যে মারাত্মক রোগ দেখা দেয় তার মূলে রয়েছে এক ধরনের ভাইরাস।

৫. **মাটির উর্বরতা হ্রাসে:** মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া কাজ করে থাকে। এ সকল উপকারি ব্যাকটেরিয়াকে কিছু ভাইরাস ধ্বংস করে মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।

৬. **মরণ ব্যাধি AIDS সৃষ্টিতে:** AIDS নামক প্রাণঘাতী রোগের জন্য দায়ী এক ধরনের ভাইরাস। HIV (Human Immunodeficiency Virus) মূলত মানবদেহে AIDS রোগ সৃষ্টি করে থাকে। AIDS হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটে। বিশ্বে বর্তমানে AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

৭. **মহামারি রোগ সৃষ্টিতে :** প্রকৃতিতে অনেক ভাইরাস রয়েছে যাদের আক্রমণ মহামারি (epidemic) আকারে দেখা দেয় এবং খুব দ্রুত অসংখ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু ভাইরাস বিশ্বব্যাপী (pandemic) মানুষের রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। যেমন-SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ২০০৩ সালে কানাডা, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে প্রায় ৮০০ লোকের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮ সালে বার্ড ফ্লু মহামারি আকার ধারণ করেছিল। বর্তমানে COVID-19 রোগটি বিশ্বব্যাপী মহামারির আকার ধারণ **করে ত্রিশ লক্ষের অধিক** লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে (২১ শে এপ্রিল-২০২১)।

৮. **সর্দি-জ্বর সৃষ্টিতে :** ভাইরাসের আক্রমণে অধিকাংশ সময় মানুষের সর্দি-জ্বর হয়ে থাকে।

ভাইরাসের উপকারিতা

১. **প্রতিষেধক তৈরিতে :** বসন্ত, পোলিও, জন্ডিস, হাম, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক ভাইরাস থেকেই তৈরি হয়।

২. **ওষুধ হিসেবে :** কলেরা, রক্ত আমাশয়, টাইফয়েড, প্লেগ ইত্যাদি রোগের ঔষধ তৈরিতে কয়েকটি ফায ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।

৩. **গবেষণায় :** ভাইরাস বর্তমানে বংশগতীয় গবেষণা এবং আণবিক জীববিজ্ঞান গবেষণায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া জিন প্রকৌশলে বাহক হিসেবে ভাইরাসকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. **ব্যাকটেরিওফায হিসেবে:** কিছু ভাইরাস রয়েছে যারা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে আমাদের উপকার করে থাকে।

৫. **ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে:** টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বিভিন্ন ছাপ মূলত ভাইরাসের আক্রমণ। ছাপযুক্ত টিউলিপ ফুল সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বখ্যাত।

৬. **বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণে:** জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাইরাস। কারণ ভাইরাসে একই সাথে জড় এবং জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে।

৭. **পোকামাকড় দমনে:** কতিপয় ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কীটপতঙ্গ দমনে অনেক সময় ভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear Polyhydrosis Virus-কে পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

৮. **সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায়:** ফায ভাইরাস সমুদ্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে বিপুল পরিমাণ CO_2 মুক্ত করে সামুদ্রিক বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করছে বলে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে।

৯. **জৈবিক নিয়ন্ত্রণে:** জৈবিক নিয়ন্ত্রণেও ভাইরাসের ব্যবহার রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশ নিয়ন্ত্রণে মিক্সোভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি উদ্ভিদ ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম

সৃষ্ট রোগের নাম	পোষকদেহ	ভাইরাসের নাম
১. ধানের টুংরো রোগ	ধান	টুংরো ভাইরাস (Tungro Virus)
২. গোলআলুর মোজাইক রোগ	গোলআলু	পটেটো মোজাইক ভাইরাস (Potato Mosaic Virus)
৩. শিমের মোজাইক রোগ	শিম	বীন মোজাইক ভাইরাস (Bean Mosaic Virus)
৪. তামাকের মোজাইক রোগ	তামাক	টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus)
৫. টমেটোর বুশিস্টান্ট রোগ	টমেটো	বুশি স্টান্ট ভাইরাস (Bushy Staut Virus)
৬. কলার বানচি টপ রোগ	কলা	বানচি টপ ভাইরাস (Bunchy Top Virus)

CamScanner

কয়েকটি প্রাণী ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম

সৃষ্ট রোগের নাম	পোষকদেহ	ভাইরাসের নাম
১. ইনফ্লুয়েঞ্জা	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus)
২. হার্পিস	মানুষ	হার্পিস ভাইরাস (Herpes virus)
৩. জন্ডিস/লিভার ক্যান্সার	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B)
৪. জলবসন্ত (Chicken pox)	মানুষ, পশুপাখি	Varicella-Zoster Virus
৫. জলাতঙ্ক	মানুষ	র‍্যাবিস ভাইরাস (Rabis virus)
৬. ভাইরাল নিউমোনিয়া	মানুষ	Adeno virus
৭. AIDS	মানুষ	HIV ভাইরাস
৮. বার্ড ফ্লু	হাঁস-মুরগি, পাখি	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_5N_1) ভাইরাস
৯. পীত জ্বর	মানুষ	ইয়েলো ফিভার ভাইরাস (Yellow Fever virus)
১০. গো-বসন্ত	গরু	ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস (Vaccinia virus)
১১. পা ও মুখের ক্ষত (ফুট অ্যান্ড মাউথ)	গরু/ভেড়া/ছাগল/মহিষ	'ফুট অ্যান্ড মাউথ' ভাইরাস (Foot and Mouth virus)
১২. হাম	মানুষ	রুবিওলা ভাইরাস (Rubeola virus)
১৩. গুটি বসন্ত (small pox)	মানুষ	ভেরিওলা ভাইরাস (Variola virus)
১৪. Swine flue	মানুষ, শুকর	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_1N_1) ভাইরাস
১৫. চিকুনগুনিয়া	মানুষ	চিকুনগুনিয়া ভাইরাস
১৬. কোভিড-১৯	মানুষ	নভেল করোনা ভাইরাস-১৯
১৭. ইঁদুরের টিউমার	ইঁদুর	পলিওমা ভাইরাস (Polyoma virus)
১৮. ক্যাপোসি সার্কোমা	মানুষ	হার্পিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex)
১৯. এনোজেনিটাল ক্যান্সার	মানুষ	প্যাপিলোমা ভাইরাস (Papiloma virus)
২০. SARS	মানুষ	Nipah virus
২১. কোষের লাইসিস (Lysis)	মানুষ	Ebola virus
২২. সাধারণ সর্দি	মানুষ	Rhino virus

একক কাজ

ভাইরাসের অপকারিতা ও উপকারিতাসমূহ পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করো।

পাঠ ৪

ভাইরাসজনিত রোগ : পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক
Viral Disease : Ring Spot or Mosaic of Papaya

৪.৫ পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ
(Ring Spot or Mosaic Disease of Papaya)

পেঁপের রিংস্পট একটি ধ্বংসাত্মক রোগ। আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন পেঁপে উৎপাদনকারী অঞ্চলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। বাংলাদেশসহ চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, ভারত, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এ রোগের অধিকতর প্রকোপ ঘটতে দেখা গেছে। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ জেনসন ১৯৪৯ সালে এ রোগের নামকরণ করেন রিংস্পট।

CamScanner

৪.৫.১ রোগের কারণ (Reason)

পেঁপের রিংস্পট রোগের জীবাণু PRSV (Papaya Ring Spot Virus) নামে পরিচিত। এটি *Potyvirus* গণের Potyviridae গোত্রের অন্তর্গত। ভাইরাস অনাবৃত এবং নমনীয় দণ্ডাকৃতি (৭৬০–৮০০nm × ১২nm)। এর দু'টি প্রকরণ আছে, যেমন- PRSV-w ও PRSV-p। তবে এর মধ্যে PRSV-p এর প্রকোপ বেশি। এতে এক সূত্রক RNA থাকে।

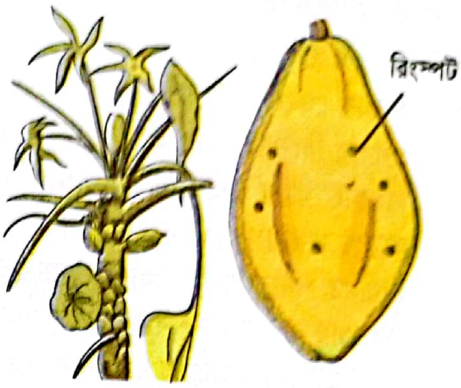

ক খ

চিত্র-৪.৭: ক. মোজাইক রোগে আক্রান্ত পেঁপে গাছ
খ. মোজাইক রোগে আক্রান্ত পেঁপে

৪.৫.২ রোগের বিস্তার (Spreading)

জাব পোকা ও সাদা মাছি (Melon Aphid– *Aplus gossypil* and Peach Aphid– *Myzus persicae*) সহ বেশ কয়েক প্রজাতির এফিড বাহক হিসেবে রোগের বিস্তার ঘটায়। তবে গাছ ছাঁটার সময় যান্ত্রিকভাবে রোগ বিস্তার ঘটতে পারে। জাব পোকা আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করলে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ভাইরাস পোকার দেহে চলে আসে ও সংক্রমিত করে।

৪.৫.৩ রোগের লক্ষণ (Symptoms)

১. আক্রান্ত পেঁপে গাছের পাতার ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে হলদে-সবুজ মোজাইকের মতো দাগ সৃষ্টি হয়।
২. গাছের অগ্রভাগের কচি পাতাগুলো আকৃতিতে ছোট হয় এবং পাতাগুলো কুকড়ে যায়।
৩. রোগের তীব্রতায় সমস্ত পাতায় মোজাইক সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় পাতা ঝরে পড়ে। আবার কখনও কখনও কেবল পাতার শিরাগুলো থাকে।
৪. আক্রান্ত গাছের কচি পাতায় তৈলাক্ত গোলাকৃতির দাগ পড়ে এবং শিরা বরাবর অসংখ্য স্বচ্ছ চিহ্ন দেখা যায়।
৫. আক্রান্ত পেঁপের উপর পানি ভেজা গোলাকার দাগ পড়ে এবং দাগের মধ্যবর্তী স্থান শক্ত হয়ে যায়।
৬. আক্রান্ত পাতার বৃন্ত ও কাণ্ডে গাঢ় সবুজ বর্ণের দাগ ও লম্বা ডোরা দেখা যায়।
৭. পেঁপের আকার ছোট হয়, হলুদ-সবুজ ছোপ মতো বর্ণ ধারণ করে, রিংস্পট লক্ষণ দেখা দেয়। অনেক সময় পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই ফল ঝরে পড়ে।
৮. পেঁপের মিষ্টতা ও পেপেইন হ্রাস পায়।
৯. আক্রান্ত পাতার ডাটা খর্বাকৃতির হয় এবং শীর্ষ পাতাগুলো খাড়া অবস্থায় থাকে।
১০. অল্প বয়স্ক গাছ আক্রান্ত হলে তাদের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় এবং গাছে ফল ধরে না।
১১. রোগের তীব্রতা তথা চরম পর্যায়ে আক্রান্ত গাছ পচে মরে যায়।
১২. আক্রান্ত গাছের ফলন শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেয়ে থাকে।

৪.৫.৪ প্রতিকার/নিয়ন্ত্রণের উপায় (Remedy)

নিম্নলিখিত উপায়ে এ রোগটির প্রতিকার সম্ভব—

১. পেঁপে ক্ষেতে রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছকে উপড়ে ফেলে মাটি চাপা দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২. এফিড বা জাব পোকা নিধনের জন্য কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।
৩. আক্রান্ত ক্ষেতের কোনো গাছের পাতা কাটা, ছাঁটা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ কাটা বা যেকোনো ক্ষতস্থান দিয়ে ভাইরাস সুস্থ উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করতে পারে।
৪. প্রয়োজনে জাল দিয়ে সমস্ত পেঁপে বাগান ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড বা জাব পোকার আক্রমণ না ঘটে।
৫. ক্ষেতে চারা লাগানোর শুরু থেকেই নিয়মিতভাবে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এতে এফিড দ্বারা রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
৬. পেঁপে ক্ষেতের চারিদিকে এমনকি পেঁপে গাছের সারির মাঝে অপোষক ফসল আবাদ করলে এ রোগের মাত্রা অনেকাংশেই কমে আসে।

CamScanner

৪.৫.৫ প্রতিরোধের উপায় (Prevention)

১. এ রোগ প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হলো রোগমুক্ত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা জমিতে রোপন করতে হবে।
২. আক্রান্ত ক্ষেতের আশেপাশে নতুন কোনো পেঁপে ক্ষেত তৈরি করা যাবে না।
৩. পেঁপের রিংস্পট রোগ প্রতিরোধক্ষম ট্রান্সজেনিক পেঁপের আবাদ করে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব। ১৯৯৮ সালে হাওয়াই দ্বীপে রেইনবো (rainbow) ও সানআপ (sunup) নামক দুটি ট্রান্সজেনিক পেঁপের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যারা PRSV প্রতিরোধী।
৪. নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ অপসারণ করতে হবে।
৫. মিশ্র চাষ বা আবাদের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।
৬. রোগ প্রতিরোধী জাতের আবাদ করতে হবে।
৭. ক্রস প্রোটেকশন পদ্ধতি উদ্ভাবিত চারা আবাদের মাধ্যমে পেঁপের এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দলীয় কাজ

দলগতভাবে নিকটস্থ কোনো পেঁপে ক্ষেতে গিয়ে রিংস্পট আক্রান্ত পেঁপে গাছের পাতা ও ফল সংগ্রহ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ করো ও শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও।

পাঠ ৫ ও ৬

ভাইরাসজনিত রোগ: হেপাটাইটিস ও ডেঙ্গু জ্বর
Virus Disease : Hepatitis and Dengue Fever

৪.৬ হেপাটাইটিস (Hepatitis)

হেপাটাইটিস হলো এক ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগ যা লিভার বা যকৃতের প্রদাহ সৃষ্টি করে। এটি জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। বিভিন্ন প্রকার হেপাটাইটিসের মধ্যে হেপাটাইটিস-সি সবচেয়ে মারাত্মক। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩% এবং বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লাখ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারে স্থায়ী সংক্রমণ গড়ে তোলে, যা ১০—১৫ বছরের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই হেপাটাইটিস-সি কে বলা যায় **"তুষের আগুন"** এবং আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ সময় মারা যায়।

৪.৬.১ রোগের কারণ (Reason)

পাঁচ ধরনের ভাইরাস সংক্রমণের ফলে হেপাটাইটিস রোগ হতে দেখা যায়। যথা—

১. হেপাটাইটিস-এ ভাইরাস (HAV),
২. হেপাটাইটিস- বি ভাইরাস (HBV),
৩. হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস (HCV),
৪. হেপাটাইটিস-ডি ভাইরাস (HDV) এবং
৫. হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস (HEV)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেপাটাইটিস-বি (DNA ভাইরাস) ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণের তীব্রতা ও ক্রনিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এছাড়া সাইটোমেগালো ভাইরাস, এপিস্টেইন বার ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ও হার্পিস জুস্টার ভাইরাস কখনও কখনও শিশুর হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। নিচের সারণিতে প্রধান প্রধান হেপাটাইটিস ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো (Davidson, 21th ed. 2010)।

বৈশিষ্ট্য	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
ভাইরাস গ্রুপ	এন্টারো ভাইরাস	হেপাডিএনএ ভাইরাস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	অসম্পূর্ণ ভাইরাস	ক্যালিসি ভাইরাস
নিউক্লিক অ্যাসিড	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA
আয়তন	২৭nm	৪২nm	৩০-৩৮nm	৩৫nm	২৭nm
সুপ্তকাল	১৪-২৮ দিন	৪৫-১৮০ দিন	১৪-১৮০ দিন	২১-৪৯ দিন	২১-৫৬ দিন

CamScanner

সব ধরনের ভাইরাস সংক্রমণ একই ধরনের লক্ষণ বিশিষ্ট অসুস্থতার সৃষ্টি করে, যার প্রকাশ ঘটে জন্ডিসের মাধ্যমে বা কোনো প্রকার লক্ষণ ছাড়াই। তবে এদের মধ্যে রোগের তীব্রতা ও রোগ স্থায়ীত্বে পার্থক্য দেখা যায়।

৪.৬.২ তীব্র সংক্রমণের লক্ষণসমূহ (Symptoms)

১. হেপাটাইটিস রোগের প্রাথমিক পূর্ব লক্ষণ হিসেবে মাথা ব্যথা, মাংসপেশির ব্যথা, হাড়ের ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব দেখা দেয়।
২. দু'সপ্তাহের মধ্যে জন্ডিস সৃষ্টি হয়।
৩. এ সময় বমি বা ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে ও শারীরিক অস্থিরতা অনুভূত হয়।
৪. জন্ডিসের কারণে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ বর্ণের এবং মলের রং ধূসর হতে দেখা যায়।
৫. যকৃত সামান্য বড় হয়।
৬. শিশুদের অতিরিক্ত জন্ডিস, অত্যধিক বমি, রক্তক্ষরণ, পেট ফোলা, ঘুমের অনিয়ম ও পেট ব্যথা দেখা দিতে পারে।
৭. রোগের লক্ষণ ৩-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত কদাচিৎ দেখা যায় ও ক্রমে জটিলতা বাড়তে থাকে, যেমন- যকৃতের কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে।
৮. বি ও সি ভাইরাসের সংক্রমণে লিভার সিরোসিস ঘটে।
৯. রক্তে বিলিরুবিনের এবং SGPT-এর মাত্রা বেড়ে যায়।
১০. ক্লান্তি লাগা, সাধারণত অস্বস্তি বোধ ও মৃদু জ্বর অনুভব করা।

৪.৬.৩ রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা হেপাটাইটিসের তীব্রতা বোঝা যায়। রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ, এলএফটি, প্রোথ্রম্বিন টাইম, অ্যালবুমিন, আলট্রাসনোগ্রাম ও ভাইরাস জীবাণু অনুসন্ধানের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। এলএফটি (LFT = Liver Function Test) পরীক্ষায় হেপাটাইটিসে রক্তরসে ট্রান্সঅ্যামাইনেজের পরিমাণ ২০০-২০০০ U/L হতে পারে। বিলিরুবিনের পরিমাণ দেখে যকৃতের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। রক্ত জমাট বাঁধার সময় বেশি লাগার ওপর হেপাটাইটিসের তীব্রতা বুঝতে পারা যায়। তীব্র লিভার বিকল অবস্থায় রক্ত জমাট বাঁধতে ২৫ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগতে পারে। ক্রনিক HBV শনাক্ত করতে রক্তের HB_sA_g এবং Anti-HBe (IgG) এর পরিমাণ জানতে হয়।

৪.৬.৪ চিকিৎসা (Treatment)

অধিকাংশ হেপাটাইটিস রোগীর (A, E) হসপিটালে ভর্তির প্রয়োজন পড়ে না। হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীর প্রচুর বিশ্রাম ও গ্লুকোজ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ প্রয়োজন। মাতৃদেহ থেকে সন্তানে যাতে ভাইরাস প্রবেশ না করতে পারে এজন্য গর্ভবতী মায়েদের টিকা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। হেপাটাইটিস- B ও C দ্বারা আক্রান্ত রোগীর পরবর্তীতে লিভার ক্যান্সার ও লিভার সিরোসিস হতে পারে বলে সুচিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ পেগাসিস এবং রিবাভাইরিন বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় ও বাজারে সহজ প্রাপ্য। তবে হেপাটাইটিস-B এর জন্য প্রতিরোধী টিকা আবিষ্কার হয়েছে।

৪.৬.৫ পথ্য (Medicine)

হেপাটাইটিস রোগীর জন্য সহজপাচ্য খাবার অল্প অল্প করে বার বার দিতে হবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, মাদক ও ক্ষতিকারক ওষুধ অবশ্য বর্জনীয়। রোগীকে ঘন ঘন পানি পান করতে হবে এবং পরিমিত বিশ্রামসহ শারীরিক পরিশ্রম পরিহার করতে হবে।

৪.৬.৬ প্রতিকারের উপায় (Remedy)

১. রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।
২. খাবারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে।
৩. বিশুদ্ধ পানি, ডাবের পানি, আখের রস, ডালিমের রস, গ্লুকোজের সরবত ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পান করতে হবে।
৪. সহজ পাচ্য খাবার বিশেষ করে ছোট মাছ, মুরগির ঝোল, পেঁপে, লাউ, পটল, করলা ইত্যাদি সবজি খেতে হবে।
৫. কোমল পানীয় পরিহার করতে হবে। খোলা ও বাসি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৬. নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।

CamScanner

৪.৬.৭ প্রতিরোধের উপায় (Prevention)

১. এ রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো ভ্যাক্সিন গ্রহণ করা।
২. খাবার ও পানি গ্রহণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
৩. কোনো কারণে কাউকে রক্ত দিতে হলে বা রক্ত নিতে হলে অবশ্যই রক্তে হেপাটাইটিস B ও C-এর উপস্থিতি নির্ণয় করতে হবে।
৪. সেলুনে শেভ করা পরিহার করতে হবে, কিংবা সেলুনে গেলেও প্রতিজনের জন্য আলাদা ব্লেডের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫. ইনজেকশনের ক্ষেত্রে সর্বদা ডিসপোজেবল সিরিজ ব্যবহার করতে হবে।
৬. অনেক সময় মায়ের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে হেপাটাইটিস-B ও C ছড়ায়। সুতরাং মাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং শিশুদের জন্মের পর হেপাটাইটিস A ও B ভাইরাসের টিকা দিতে হবে।
৭. ব্যক্তিগত টয়লেট্রিজ দ্রব্য, যেমন-রেজার, ব্লেড, ব্রাশ, নেইলকাটার ইত্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার না করা।
৮. এ রোগের সংক্রমণ রোধের জন্য জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

একক কাজ

তোমার এলাকায় হেপাটাইটিস এর সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক পোস্টার অঙ্কন করো।

৪.৭ ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever)

ট্রপিক্যাল অঞ্চলের একটি সাধারণ রোগ ডেঙ্গু বা ডেঙ্গী জ্বর। বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে এন্ডেমিক বা আঞ্চলিক রোগ হিসেবে ডেঙ্গু জ্বর হতে দেখা যায়। এ রোগের কারণে হাড়ে (মেরুদণ্ড বা কোমর) প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় বলে অনেকে একে **'হাড় ভাঙ্গা জ্বর'** (break bone fever)-ও বলে থাকেন। ১৭৭৯ সালে প্রথম এ রোগের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় ১১০টি দেশে এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। ২০০১ ও ২০০২ সালে বাংলাদেশে এ রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে ও বেশ কিছু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

৪.৭.১ রোগের কারণ (Reason)

ডেঙ্গু একটি ফ্ল্যাভি ভাইরাসজনিত রোগ। এডিস প্রজাতির (*Aedes aegypti*) মশকী ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে *Aedes albopictus* বাহক হিসেবে দেখা যায়। শুধু স্ত্রী মশা তার ডিম উৎপাদনের প্রয়োজনে দিনের বেলায় মানুষের রক্ত পান করে। মশকীর দেহে ভাইরাস স্থায়ী প্রকৃতির এবং দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে। মশকীর লালার সাথে রোগজীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ আছে। যেমন–

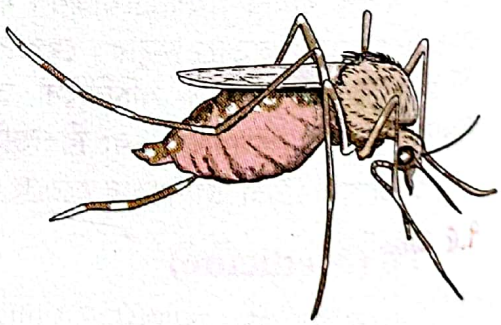

চিত্র-৪.৮: এডিস মশা

১. DENV-1, ২.DENV-2, ৩. DENV-3, ৪. DENV-4

একবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে দেহে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা হোমোটাইপের (একই ধরনের ভাইরাস) জন্য আজীবন ও হেটারোটাইপের (ভিন্ন ধরনের ভাইরাস) জন্য এক বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে এবং পরে প্রবল জটিলতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

৪.৭.২ রোগের লক্ষণ (Symptoms)

সাধারণভাবে এ রোগ উপসর্গবিহীন (৮০%) অথবা সাধারণ জ্বরের মত। স্বল্প ক্ষেত্রে (৫%) জটিল ও প্রাণঘাতী হয়। ভাইরাসবাহী এডিস মশকী কামড়ানোর ২-৭ দিনের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণ অনুসারে ডেঙ্গু জ্বর, তিন প্রকার—

CamScanner

ক. **স্বাভাবিক ডেঙ্গু জ্বর**

১. জ্বর (১০৩–১০৫° ফা.)।
২. মাথা ব্যথা, পেশি ও গিটে ব্যথা।
৩. র‍্যাশ (ছোট ছোট লাল ফুসকুঁড়ি) এবং লিম্ফনোড স্ফীত হয়।
৪. মেরুদণ্ডসহ কোমরে ব্যথা এ রোগের বিশেষ লক্ষণ।
৫. চোখ নাড়াতে ব্যথা লাগে।
৬. ২-৩ দিন পরে র‍্যাশ মিলিয়ে যায়।
৭. সাধারণত জ্বর ৩-৬ দিন প্রলম্বিত হয়। ৩য় দিনে জ্বরের মাত্রা কমে গেলেও পুনরায় বৃদ্ধি পেতে পারে।

খ. **হিমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর**

১. সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরের মতোই প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়।
২. তীব্র সংক্রমণে ৩-৪ দিন পর দাঁতের মাড়ি, নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।
৩. ত্বকের নিচে, চোখের কোণে রক্ত জমাট বাঁধতে দেখা যায় অথবা আন্ত্রিক রক্ত ক্ষরণ ঘটে।
৪. রক্তে অণুচক্রিকা খুব কমে যায়।

গ. **ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম**

হেমোকনসেনট্রেশন (রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ ৭০% এর বেশি হয়) ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে রক্তচাপ খুব কমে যায়।

তিন ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে হিমোরেজিক জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোম অত্যন্ত মারাত্মক।

৪.৭.৩ রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

১. **সেরোলজি:** রক্ত পরীক্ষায় IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। অথবা তীব্র সংক্রমিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ ৪ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
২. **প্লাটিলেট টেস্ট:** রক্তের অণুচক্রিকার সংখ্যা ১,৫০,০০০/mm^3 এর অনেক নিচে নেমে যায়।
৩. **সেল কালচার:** রক্তকণিকা কালচার করে ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

৪.৭.৪ প্রতিকারের উপায় (Remedy)

এ রোগের কোনো অ্যান্টিভাইরাস এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। যথাযথ যত্ন ও চিকিৎসা নিলে রোগীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এ জন্য রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন। লক্ষণ নির্ভর চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় ঘটে। রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকায় **অ্যাসপিরিন** জাতীয় ওষুধ পরিহার করা জরুরি। তবে জ্বর ও ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দেয়া হয়। স্বল্প বা মাঝারি রোগের ক্ষেত্রে রিহাইড্রেশ ওরাল বা ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড দিতে হয়। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার খেতে হবে। প্রবল রোগের ক্ষেত্রে রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য রক্ত গ্রহণ প্রয়োজন পড়ে। জ্বরে মাথায় পানি দেয়া জরুরি। আবার কখনো প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন হয়।

৪.৭.৫ প্রতিরোধের উপায় (Prevention)

এডিস মশা দ্বারা রোগ বাহিত হয় বলে মশার বাসস্থান বিনষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন। পানি জমে এমন ভাঙা পাত্র, টায়ার, ফুলের টব প্রভৃতি পরিষ্কার করা প্রয়োজন যেন পানি জমে না থাকে। সাধারণত ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা হতে ৭ দিন সময় লাগে। এজন্য ফ্রিজের তলদেশে, এয়ারকুলারের নিচে এবং ফুলের টব বা ফুলদানির পানি ৭ দিনের মধ্যে অন্তত একবার পরিষ্কার করা উচিত। দিনের বেলায় এ ধরনের মশা কামড়ায় বলে মশা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বাড়ি ঘরের আশেপাশে জঞ্জাল মুক্ত করে পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনের জন্য মশারোধক ওষুধ নিয়মিত স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

দলীয় কাজ

... বিভক্ত হও। প্রত্যেক গ্রুপের শিক্ষার্থীগণ পৃথক পৃথকভাবে ডেঙ্গু রোগের কারণ ও

CamScanner

পাঠ ৭ ও ৮

ব্যাকটেরিয়া: আবাস, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিন্যাস ও গঠন
Bacteria : Habitat, Characteristics, Classification and Structure;

Gr. *bacterion* = little rod

৪.৮ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

যেসব জীবকে খালি চোখে শনাক্ত করা যায় না এবং অণুবীক্ষণযন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাদেরকে অণুজীব (Microbes) বলে। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে ব্যাকটেরিয়াম) পৃথিবীতে আবিষ্কৃত সর্বপ্রথম অণুজীব এবং পৃথিবীর প্রথম জীবন (first life of the universe), যা আজ বিজ্ঞানীদের নিকট প্রতিষ্ঠিত মত। **এন্টনি ভন লিউয়েনহুক** (Antony von Leeuwenhoek) ১৬৭৫ সালে নিজের তৈরি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরে রাখা এক ফোটা বৃষ্টির পানি পরীক্ষা করে তাতে ক্ষুদ্র দণ্ডাকার জীবের অস্তিত্ব দেখতে পান। তিনি এর নাম দেন *Animalcules* বা ক্ষুদ্র প্রাণী। এজন্য **লিউয়েনহুক কে ব্যাকটেরিওলজির জনক বলা হয়।** পরবর্তীতে জার্মান বিজ্ঞানী **এরেনবার্গ** (C.G. Ehrenberg, 1829) উক্ত অণুজীবকে **ব্যাকটেরিয়া** (Gr. baxroov– অর্থ ক্ষুদ্র দণ্ড) নামকরণ করেন। পরবর্তীতে ব্যাকটেরিওলজি শাখা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে **লুই পাস্তুর** এর ব্যাপক অবদান রয়েছে। সেজন্য তাঁকে **আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক** বলা হয়। **ব্যাকটেরিয়া হলো এককোষী, আণুবীক্ষণিক, আদিকোষী অণুজীব যা সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন, জটিল কোষ প্রাচীর বিশিষ্ট এবং প্রধানত দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।** ৩৬০ কোটি বছর পূর্বে আর্কিওজোইক মহাযুগে এমন আদিকোষী জীবের উৎপত্তি ঘটেছিল। মারগুলিসের পঞ্চজগত শ্রেণিবিন্যাসে ব্যাকটেরিয়াসহ সকল আদিকোষী অণুজীব Monera জগতের অধীনে।

প্রকৃত অর্থে ব্যাকটেরিয়া শব্দ দিয়ে এক বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ট্যাক্সাকে বোঝায়। এ কারণে এদের মধ্যে নানা প্রকারভেদ গড়ে উঠেছে। যেমন: **ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, অ্যাক্টিনোব্যাকটেরিয়া** (অ্যাক্টিনোমাইসিটিস) আগে থেকেই পরিচিত থাকলেও আর্কিব্যাকটেরিয়া একেবারেই নতুন একটা গ্রুপ। এমনকি ইদানিং মাইকোপ্লাজমাকেও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ধরা হচ্ছে। যাই হোক, এদের মধ্যে সকল আর্কিব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর চরম ভাবাপন্ন পরিবেশে বসবাস করে এবং তাদের শারীরবৃত্তীয় কৌশল অনেকাংশে ভিন্ন। এদের মধ্যে কিছু লবণ প্রিয়, কিছু তাপ প্রিয়, কিছু অম্লীয় পরিবেশ পছন্দ করে। এদের rRNA ভিন্ন টাইপের হওয়ায় জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসে নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪৭২ টি বিভিন্ন গ্রুপের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি জানা গেছে।

জেনে রাখো

আর্কিব্যাকটেরিয়া সাধারণভাবে আর্কিয়া নামে পরিচিত। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে এরা বাস করতে পারে। এদের মধ্যে কিছু Heat lover সদস্য আছে; যেমন– *Methanopyrus* ১১০° সে. তাপমাত্রায় টিকে থাকে। ভালো বৃদ্ধি ঘটে ৯৮° সে. তাপমাত্রায় এবং ৮৪° সে. এর কম তাপমাত্রায় মরে যায়।

৪.৮.১ ব্যাকটেরিয়ার আবাস (Habitat of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। পানি, বায়ু, মাটি, জীবদেহের বাইরে-ভেতরে, জৈব, অজৈব বস্তু সব জায়গাতেই ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত। প্রকৃতিতে প্রচণ্ড ঠান্ডা (-১৭০° সে.) থেকে শুরু করে ৮০° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। কিছু ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে পরজীবী হিসেবে থাকে আবার কিছু মিথোজীবী হিসেবে থাকে। এছাড়া যেখানে যত বেশি জৈব পদার্থ সেখানে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ব্যাপক। এ জন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ আবাদি মাটি, জলাশয়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। প্রচুর ব্যাকটেরিয়া বাতাসে ভেসে বেড়ায়, তবে বেশি উঁচুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে না।

৪.৮.২ ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics of Bacteria)

১. ব্যাকটেরিয়া এককোষী তবে একাধিক কোষ একত্রে কলোনি গঠন করতে পারে।
২. এরা আদিকোষী অর্থাৎ কোষে সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত বরং এখানে একটি বৃত্তাকার DNA ও সাইটোপ্লাজম জুড়ে ছড়ানো থাকে।
৩. রাইবোসোম (70S) ছাড়া অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু অনুপস্থিত।
৪. সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন তবে কিছু সদস্য স্বভোজী।

CamScanner

৫. কোষ প্রাচীর দ্বিস্তরী এবং কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপেপটাইড। এছাড়া পলিস্যাকারাইড, মুরামিক অ্যাসিড প্রভৃতির সমন্বয়ে জটিল কোষ প্রাচীর বিদ্যমান।
৬. সাধারণত দ্বি-বিভাজন (অ্যামাইটোসিস) প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি করে।
৭. কতিপয় সদস্যের কোষ প্রাচীরের বাইরে সূত্রাকার ফ্ল্যাজেলা অথবা পিলি থাকে।
৮. সকল ব্যাকটেরিয়া আণুবীক্ষণিক, ক্ষুদ্রতম ও সরলতম অণুজীব।
৯. এরা সাধারণত বেসিক রং ধারণ করতে পারে (গ্রাম পজেটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ)।
১০. ব্যাকটেরিয়া সাধারণত ফায ভাইরাসের প্রতি খুবই সংবেদনশীল।
১১. প্রকৃত ক্রোমোসোম না থাকায় এরা মাইটোসিস ও মায়োসিসে অংশ নেয় না।
১২ বিশেষ পদ্ধতিতে এদের জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে।
১৩. অধিকাংশই অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে।
১৪. এরা বায়বীয়, অবায়বীয় অথবা বাধ্যতামূলক বায়বীয় স্বভাবের।
১৫. প্রচণ্ড ঠাণ্ডা (-১৭° সে.) থেকে শুরু করে ৮০° সে. তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে।
১৬. এন্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে বহু বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে।

৪.৮.৩ ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Bacteria)

ক. আকৃতি অনুসারে

আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়—

১. **কক্কাস (Coccus):** যে ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি গোলাকার বা ডিম্বাকার তাদের কক্কাস বলে। এরা সজ্জারীতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার।
   i. **মাইক্রোকক্কাস (Micrococcus):** কক্কাস ব্যাকটেরিয়া যখন এককভাবে অবস্থান করে তখন মাইক্রোকক্কাস বলে। যেমন- *Micrococcus flavus.*
   ii. **ডিপ্লোকক্কাস (Diplococcus):** যখন কক্কাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। যেমন– *Diplococcus pneumoniae.*
   iii. **টেট্রাকক্কাস (Tetracoccus):** যখন চারটি কক্কাস একই সমতলে বাস করে। যেমন– *Gaffkya tetragena.*
   iv. **স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus):** কক্কাস ব্যাকটেরিয়া যখন পরস্পর চেইন আকারে সজ্জিত থাকে। যেমন– *Streptococcus lactis.*
   v. **স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus):** কক্কাসগুলো যখন অনির্দিষ্ট গুচ্ছ সৃষ্টি করে অবস্থান করে। যেমন– *Staphylococcus aureus.*
   vi. **সারসিনা (Sarcina):** যখন নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ নির্দিষ্ট সাজে সজ্জিত থাকে তাকে সারসিনা বলে। যেমন– *Sarcina lutea.*

২. **ব্যাসিলাস (Bacillus) :** যে ব্যাকটেরিয়া দণ্ডাকৃতির তাদের ব্যাসিলাস বলে। ব্যাসিলাস বিভিন্ন প্রকার:
   i. **মনোব্যাসিলাস (Monobacillus):** যখন ব্যাসিলাস এককভাবে থাকে। যেমন– *Bacillus albus.*
   ii. **ডিপ্লোব্যাসিলাস (Diplobacillus):** যখন দুটি ব্যাসিলাস পাশাপাশি সংযুক্ত থাকে। যেমন– *Moraxella lacunata.*
   iii. **স্ট্রেপটোব্যাসিলাস (Streptobacillus):** ব্যাসিলাসগুলো যখন দীর্ঘ চেইন গঠন করে। যেমন– *Streptobacillus moniliformis.*
   iv. **কক্কোব্যাসিলাস (Coccobacillus):** যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো ডিম্বাকার হয়। যেমন– *Salmonella, Mycobacterium.*

৩. **কমাকৃতি বা ভিব্রিও (Vibrio):** যে ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কমা চিহ্নের ন্যায় বাঁকা তাদের ভিব্রিও বলে। যেমন- *Vibrio cholerae*।

৪. **স্পাইরিলাম (Spirillum):** সর্পিলাকারে প্যাঁচানো দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম বলে। যেমন- *Spirillum minus*।

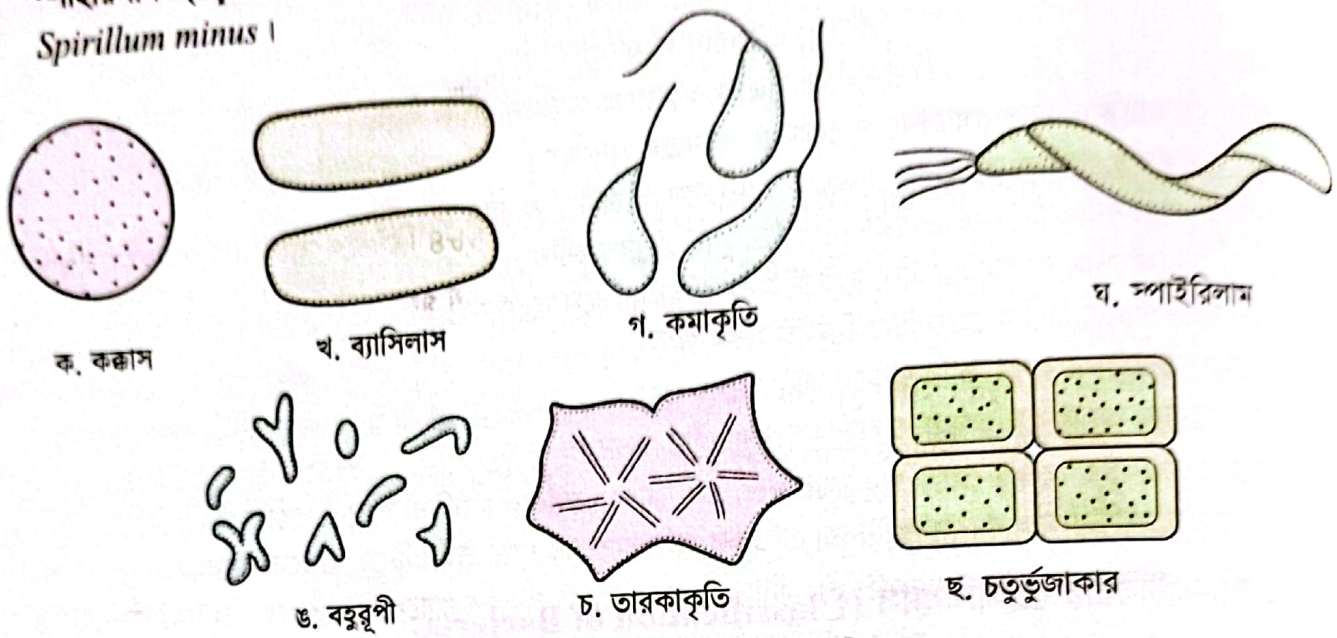

চিত্র-৪.৯: বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া

৫. **বহুরূপী (Pleomorphic):** যে ব্যাকটেরিয়া পরিবেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে তাদের বলা হয় বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া। যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার, দণ্ডাকার অথবা V, L, T প্রভৃতি আকৃতি। যেমন- *Rhizobium*

৬. **তারকাকৃতি (Star shaped):** এরা দেখতে তারার মতো। যেমন- *Stella* sp.

৭. **বর্গাকৃতি (Square shaped):** এরা দেখতে বর্গাকার। যেমন– *Haloareula.*

৮. **হাইফা সদৃশ (Hypha like):** এরা সূত্রাকার স্বভাবের। যেমন– *Streptomyces scabies.*

খ. ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা ও অবস্থান অনুসারে

ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা ও অবস্থান অনুসারে ব্যাকটেরিয়া প্রধানত ছয় প্রকার। যথা—

১. **অ্যাট্রিকাস (Atrichous):** এসব ব্যাকটেরিয়াতে কোন ফ্ল্যাজেলা থাকে না; উদাহরণ - *Diphtheria bacilli*।

২. **মনোট্রিকাস (Monotrichous):** এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোষের এক প্রান্তে একটি ফ্ল্যাজেলা থাকে; উদাহরণ- *Vibrio cholerae*।

৩. **অ্যামফিট্রিকাস (Amphitrichous):** এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোষের দুই প্রান্তে দুটি ফ্ল্যাজেলা থাকে; উদাহরণ- *Spirilla serpentans*।

৪. **সেফালোট্রিকাস (Cephalotrichous):** এসব ব্যাকটেরিয়ার কোষের এক প্রান্তে একগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে; উদাহরণ- *Pseudomonas fluorescens*।

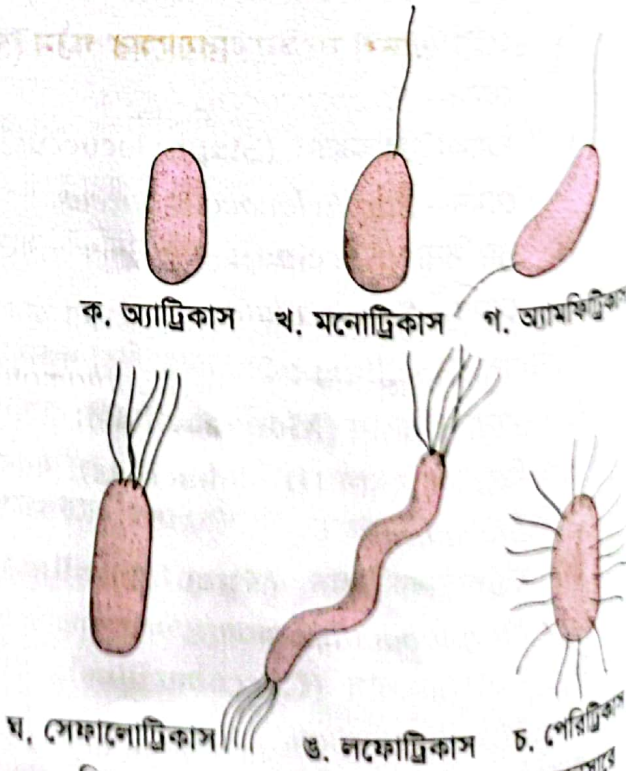

চিত্র-৪.১০: ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা ও অবস্থান অনুসারে ব্যাকটেরিয়ার ধরণ

CamScanner

৫. **লফোট্রিকাস (Lophotrichous):** এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোষের দুই প্রান্তে দুইগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে। উদাহরণ- *Spirillum volutans*।

৬. **পেরিট্রিকাস (Peritrichous):** এদের দেহের চারপাশে বহু ফ্ল্যাজেলা থাকে। উদহারণ- *Bacillus typhosus*।

গ. রঞ্জক ধারণের ক্ষমতা অনুসারে

ড্যানিশ চিকিৎসক **হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম** (Hans Christion Gram) ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়া কোষে রঞ্জিতকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই রঞ্জিতকরণ পদ্ধতিতে **গ্রাম রঞ্জন (Gram stain)** পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রধান রঞ্জক হলো **ক্রিস্টাল ভায়োলেট**। এ রঞ্জকের উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়া দুই ধরনের।

১. **গ্রাম পজিটিভ (Gram Positive):** ক্রিস্টাল ভায়োলেট রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত করে পরে তা স্পিরিট দ্বারা ধৌত করলেও যে সকল ব্যাকটেরিয়া ভায়োলেট রং ধরে রাখে তাদের গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া বলে। যেমন- *Bacillus subtilis*।

২. **গ্রাম নেগেটিভ (Gram Negative):** এরূপ ব্যাকটেরিয়া ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে কিন্তু স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে ফেললে রং চলে যায়। যেমন- *Salmonella typhi*।

ঘ. অক্সিজেনের নির্ভরশীলতা অনুসারে

অক্সিজেনের নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়া দু' প্রকার। যথা—

১. **অ্যারোবিক (Aerobic):** এ ধরনের ব্যাকটেরিয়াগুলো বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। যেমন- *Azotobacter beijerinckia*।

২. **অ্যানঅ্যারোবিক (Anaerobic):** যে সকল ব্যাকটেরিয়া বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচতে পারে তাদের বলা হয় অ্যানঅ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া। যেমন- *Clostridium*।

৪.৮.৪ একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন (Structure of a Typical Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া এককোষী এবং প্রোক্যারিওটিক। তবে প্রজাতিভেদে ব্যাকটেরিয়ার কোষের গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠনে যে সকল উপাদান পাওয়া যায় তা নিচে বর্ণনা করা হলো—

ক্যাপসিউল (Capsule): এটি কোষ প্রাচীরের বাইরের স্তর যা পলিস্যাকারাইড অথবা পলিপেপটাইডের পলিমার দিয়ে গঠিত। এ স্তরটি সাধারণত পিচ্ছিল ও আঠালো হয়, তাই একে **স্লাইম স্তরও** বলে। কিন্তু পুরু সুগঠিত ও শক্ত প্রকৃতির হলে তাকে **ক্যাপসিউল** বলে। যেমন- *Xanthomonas citri.* ক্যাপসিউল ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিকূল পরিবেশ বিশেষত শুষ্কতা হতে রক্ষা করে। তবে ক্যাপসিউল উৎপাদনের ক্ষমতা প্রজাতি বিশেষের থাকে, সবার নয়।

কোষ প্রাচীর (Cell Wall): ক্যাপসিউলের নিচে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির দৃঢ়, পুরু এবং স্থিতিস্থাপক কোষ প্রাচীর থাকে। প্রজাতিভেদে এটা ১০-২৫μm পুরু। এর প্রধান রাসায়নিক উপাদান মিউকোপ্রোটিন জাতীয় যাকে মিউরিন বা পেপটিডোগ্লাইকেন বলে। এছাড়া এতে পলিস্যাকারাইড, প্রোটিন ও লিপিড থাকে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর বেশি পুরু হয়। আবার গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে লিপিডের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। কোষ প্রাচীরের মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম (ব্যাস ১ μm) ছিদ্র থাকে। কোষ প্রাচীর কোষকে আকৃতি ও দৃঢ়তা দান করে এবং অভ্যন্তরীণ প্রোটোপ্লাজমকে সুরক্ষা করে।

CamScanner

কোষঝিল্লি (Cell Membrane): এটি কোষ প্রাচীরের নিচে অবস্থিত সূক্ষ্ম সজীব ঝিল্লি যা লিপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। তবে এতে কোলেস্টেরল থাকে না। বৈষম্যভেদ্য হওয়ায় এটি কোষের ভেতরে ও বাইরে দ্রবীভূত পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক প্রকার এনজাইম ধারণ করে। সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়াতে পিগমেন্ট ধারণের জন্য কোষঝিল্লি ভাঁজ হয়ে থাইলাকয়েডের মতো গঠন তৈরি করে।

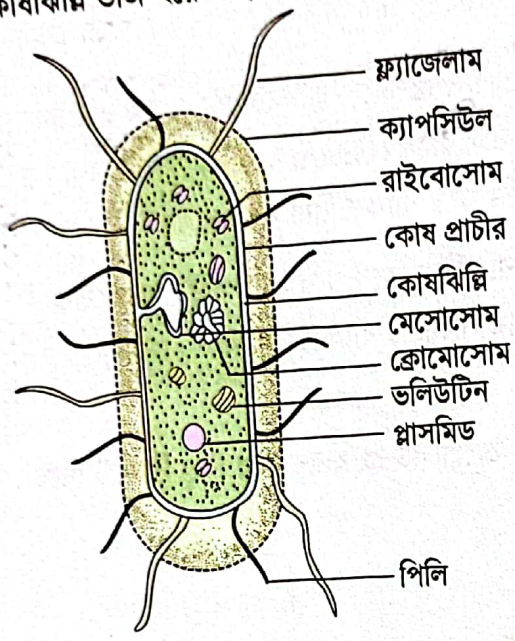

চিত্র-৪.১১: একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন

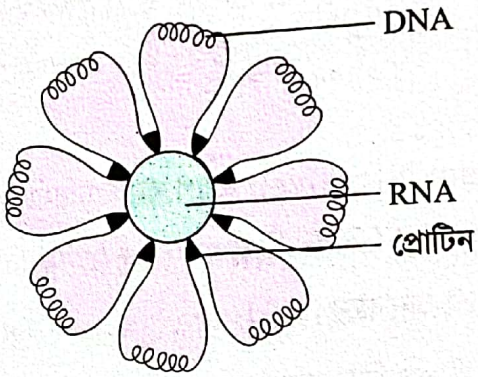

চিত্র-৪.১২: নিউক্লয়েড

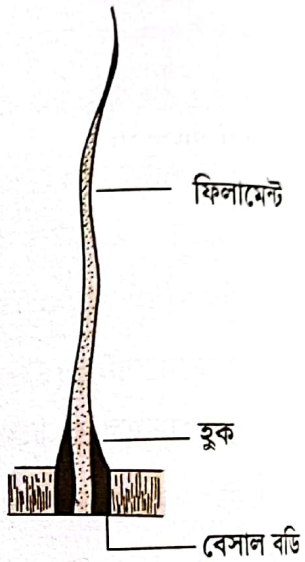

চিত্র-৪.১৩: ফ্ল্যাজেলাম

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm): কোষঝিল্লি বেষ্টিত ভেতরের দানাদার সমসত্ত্ব জলীয় দ্রবণকে সাইটোপ্লাজম বলে। এটি সাধারণত বর্ণহীন। এতে কোষগহ্বর, শর্করা জাতীয় খাদ্য, চর্বি, প্রোটিন, নানা প্রকার খনিজ পদার্থ থাকে। সাইটোপ্লাজমে নিম্নলিখিত বস্তুসমূহ থাকে–

১. **রাইবোসোম:** ক্ষুদ্র, দানাদার অঙ্গাণু যা RNA ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। রাইবোসোম 70S প্রকৃতির। প্রোটিন সংশ্লেষণ করা এর প্রধান কাজ।

২. **ক্রোম্যাটোফোর:** কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়াতে ক্রোম্যাটোফোর দেখা যায়। স্বভোজী ব্যাকটেরিয়ায় ক্রোম্যাটোফোর সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে।

৩. **কোষগহ্বর:** সাইটোপ্লাজমে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোষরস পূর্ণ কোষগহ্বর দেখা যায়।

জেনে রাখো

সাধারণত গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে মেসোসোম বেশি পরিলক্ষিত হয়, যা শ্বসনে ও কোষ বিভাজনে সাহায্য করে। কিছু স্বভোজী ব্যাকটেরিয়াতে ক্রোম্যাটোফোর থাকে। এতে ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল থাকে। এরা সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

৪. **ভলিউটিন:** ক্ষুদ্র দানাদার সঞ্চিত বস্তু, যা তরুণ কোষের সাইটোপ্লাজমে আর বয়স্ক কোষের কোষগহ্বরে থাকে।

৫. **মেসোসোম:** কোষঝিল্লি কোনো কোনো স্থানে ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো মেসোসোম গঠন করে এখানে শ্বসনের বিভিন্ন এনজাইম সঞ্চিত থাকে।

নিউক্লয়েড বা সিউডোনিউক্লিয়াস (Nucleoid): ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী এবং নিউক্লিও বস্তু শুধুমাত্র ক্রোমাটিন পদার্থ (DNA) নিয়ে গঠিত। একটি গোলাকার দ্বিসূত্রী DNA কোষ কেন্দ্রে কুণ্ডলিতভাবে অবস্থান করে। DNA অণুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ μm। এটা ক্রোমোসোম হিসেবে ভূমিকা পালন করলেও এতে **হিস্টোন প্রোটিন** থাকে না। এমনকি নিউক্লিওপর্দা ও নিউক্লিওলাস সমন্বিত সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত। এমন নিউক্লিও বস্তুকে নিউক্লয়েড বা **সিউডোনিউক্লিয়াস** বলে।

CamScanner

প্লাসমিড (Plasmid): কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মুখ্য ক্রোমোসোম (DNA) ছাড়াও অতিরিক্ত কয়েকটা ক্ষুদ্র, বৃত্তাকার DNA থাকে, যাদের প্লাসমিড বলে। প্লাসমিড স্ববিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এতে স্বল্প সংখ্যক জিন থাকে। একটি কোষে এক বা একাধিক প্লাসমিড থাকে। যেমন- *Escherichia coli.*

ফ্ল্যাজেলা (Flagella): বহু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়ার দেহে কোষ প্রাচীরের বাইরে দীর্ঘ সূত্রাকার চাবুকের মতো চলনাঙ্গ থাকে। প্রজাতি ভেদে এদের সংখ্যা এবং সজ্জারীতি বিভিন্ন ধরনের হতে দেখা যায়। এগুলো ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রতিটি ফ্ল্যাজেলামের ৩টি অংশ থাকে। যেমন– (১) ব্যাসাল বডি, (২) সংক্ষিপ্ত হুক এবং (৩) ফিলামেন্ট বা সূত্র। দণ্ডাকার বা সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়ায় সাধারণত ফ্ল্যাজেলা থাকে। আবার কক্কাস ব্যাকটেরিয়ায় সাধারণত ফ্ল্যাজেলা থাকে না।

পিলি (Pili): কতকগুলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংখ্যায় অধিক লোম সদৃশ যে অঙ্গ থাকে তাদের পিলি বলে। পিলির সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া পোষককোষের সাথে নিজেকে আবদ্ধ রাখে। এগুলো পিলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

পাঠ ৯

ব্যাকটেরিয়ার জনন
Reproduction of Bacteria

৪.৯ ব্যাকটেরিয়ার জনন (Reproduction of Bacteria)

সাধারণত তিন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন বা বংশবিস্তার ঘটে; যথা: (১) অঙ্গজ জনন (২) অযৌন জনন ও (৩) যৌন জনন।

৪.৯.১ অঙ্গজ জনন (Vegetative Reproduction)

অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া অঙ্গজ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে। প্রজাতির উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গজ জনন দু'প্রকার— (ক) দ্বি-বিভাজন ও (খ) মুকুলোদগম।

ক. **দ্বি-বিভাজন (Binary Fission):** অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে DNA ব্যাকটেরিয়া কোষের মাঝামাঝি এবং কোষঝিল্লির সাথে সংযুক্ত হয় এবং DNA রেপ্লিকেশন ঘটে। মাতৃকোষটি কিছুটা লম্বাটে হয় এবং কোষটির মধ্যভাগে কোষ প্রাচীরে বলয় আকারে সংকোচন (খাঁজ) সৃষ্টি হয়। এ সংকোচন ক্রমশ কোষকেন্দ্রের দিকে গভীর হতে থাকে। এ সময়ে কোষের নিউক্লিও বস্তু ডাম্বেলের আকার ধারণ করে। সংকোচন গভীর হওয়ায় নিউক্লিও বস্তুসহ কোষটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দুটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয়। অপত্য কোষ দুটি কিছু সময় যুক্ত থাকার পর স্ফীতি চাপের কারণে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সাধারণত দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। যেমন- *Escherichia coli.*

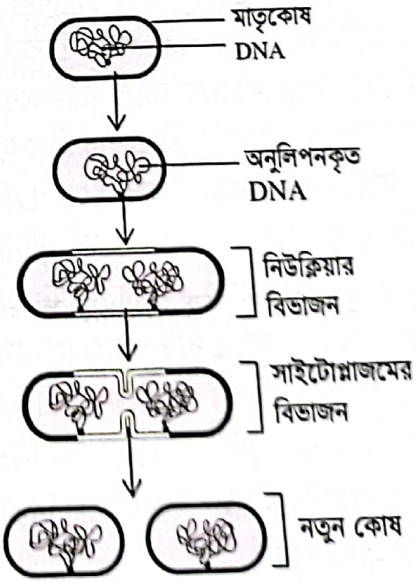

চিত্র-৪.১৪: দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি

CamScanner

খ. **মুকুলোদগম (Budding):** কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অনুকূল পরিবেশে মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে। প্রথমে কোষ প্রাচীরের বিশেষ অংশ কোমল হয় এবং উঁচু হয়ে কুঁড়ির মতো স্ফীত হয়ে ওঠে। মাতৃকোষের নিউক্লিও বস্তু (DNA) এ সময়ে বিভক্ত হয়ে দুটি খণ্ড গঠন করে এবং এদের একটি মুকুলে প্রবেশ করে। মুকুল ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং বিভেদ প্রাচীর তৈরির মাধ্যমে মাতৃকোষ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এ সময় মাতৃকোষ থেকে মুকুল বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য ব্যাকটেরিয়ারূপে জীবন আরম্ভ করে। যেমন- *Rhodopseudomonas.*

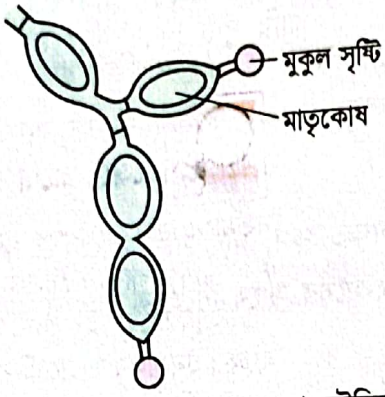

চিত্র-৪.১৫: মুকুলোদগমের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার জনন

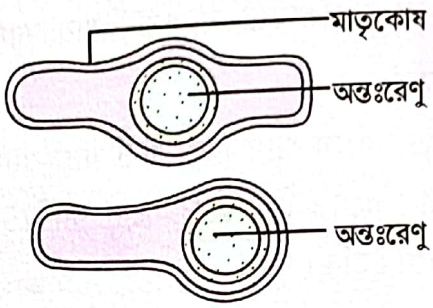

চিত্র-৪.১৬: ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃরেণু

৪.৯.২ অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

প্রকৃত ব্যাকটেরিয়ায় কোনো প্রকার স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে না তবে প্রতিকূল পরিবেশে কতিপয় এককোষী ব্যাকটেরিয়া কোষের অভ্যন্তরে **অন্তঃরেণু** (endospore) নামক এক ধরনের প্রতিকূলজীবী রেণু উৎপন্ন হয়। অন্তঃরেণু গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং অত্যন্ত পুরু প্রাচীরে আবৃত থাকে। অনুকূল পরিবেশে অন্তঃরেণু অঙ্কুরিত হয়ে একটি মাত্র ব্যাকটেরিয়া কোষ সৃষ্টি করে। ফলে এ পদ্ধতিতে কখনও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না। যেমন- *Clostridium.*

৪.৯.৩ যৌন জনন (Sexual Reproduction)

১৯৪৬ সালে **লেডারবার্গ** (Lederberg) ও **এডওয়ার্ড টেটাম** (Edward Tatum) *E. coli* প্রজাতিতে কনজুগেশনের অনুরূপ বিশেষ ধরনের যৌন জনন আবিষ্কার করেন, যা **বংশগতীয় পুনঃর্বিন্যাস** (Genetic recombination) হিসেবে পরিচিত। তবে এ পদ্ধতি স্বাভাবিক যৌন জননের মত নয় এবং এতে সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটে না। এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন গণের সদস্যদের মধ্যেও হতে দেখা যায়। যেমন: *E. coli* এর সাথে *Salmonella.*

এ প্রক্রিয়ার শুরুতে বিপরীত যৌনধর্মী দাতা ও গ্রহীতা নামক (+, –) দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ পরস্পরের নিকটে আসে এবং কোষ দুটি হতে সরু ঠোঁটের ন্যায় সংশ্লেষ নালি পরস্পরের দিকে বৃদ্ধি পায়। এরপর দুটির প্রান্ত যুক্ত হয় ও মধ্যবর্তী প্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে সংশ্লেষ নালি তৈরি হয়। এ নালি পথে দাতা কোষ হতে DNA-এর কিছু অংশ গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। এরপর কোষ দুটির মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে গ্রহীতা কোষে **অসম্পূর্ণ জাইগোট বা মেরোজাইগোট** (merozygote) গঠিত হয়। এ সময় দুটি ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার ঘটে। গ্রহীতা কোষ দ্বি-বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। এর ফলে নতুন সৃষ্ট অপত্য কোষে মিশ্র চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। তবে দাতা কোষটি আংশিক DNA হারিয়ে বিভাজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ও এক পর্যায়ে মারা যায়।

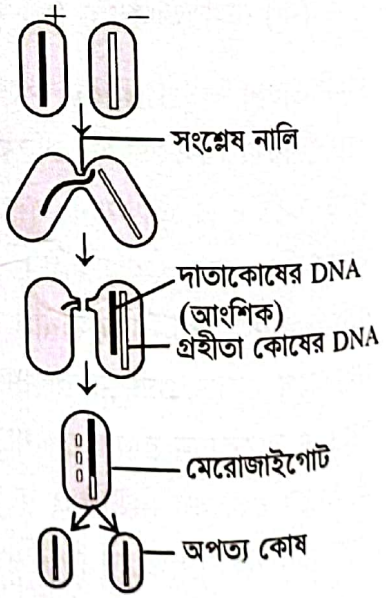

চিত্র-৪.১৭: ব্যাকটেরিয়ার যৌন

বাড়ির কাজ

ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন ধরনের জননের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

CamScanner

৪.১০ ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব (Importance of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতিকর ভূমিকার জন্য এটি মানুষের যেমন চরম শত্রু তেমনি অসংখ্য উপকারি ভূমিকার জন্য পরম বন্ধুও। এ কারণে ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্বে উপকারি ও অপকারি দুটি দিকই রয়েছে। নিচে ব্যাকটেরিয়ার কতিপয় উপকারি ও অপকারি ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

উপকারিতা (Advantage)

১. চিকিৎসা ক্ষেত্রে

- **অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে:** সাবটিলিন (*Bacillus subtilis* হতে), পলিমিক্সিন (*Bacillus polymyxa* হতে) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়।
- **প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে:** কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয় ব্যাকটেরিয়া হতে। ডি.পি.টি (ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি ও ধনুষ্টংকার) রোগের টিকা বা প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। *Corynebacterium diphtheriae* (D), *Bordetella pertussis* (P) এবং *Clostridium tetani* (T) হতে DPT (D=Diphtheria, P = Pertussis, T = Tetanus) নামকরণ করা হয়েছে।

জেনে রাখো

বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগের অন্যতম ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এরিথ্রোপোইটিন, টিপিত্র, ইন্টারফেরন প্রভৃতি ঔষুধ উৎপাদনে ব্যাকটেরিয়ার কোনো বিকল্প নেই।

Bacillus subtilis থেকে রিবোফ্লাভিন বা Vitamin B_2 তৈরি হয়।

২. কৃষিক্ষেত্রে

- **মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি:** মৃত গাছপালা ও প্রাণিদেহ, গোবর কিংবা ময়লা আবর্জনার পচন, বিগলন ও পরিশেষে জৈব পদার্থ মাটির সাথে মিশিয়ে মাটিকে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ও উর্বর করে তোলে।
- **নাইট্রোজেন সংবন্ধন:** *Azotobacter, Clostridium, Pseudomonas* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি লবণে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়। শিম জাতীয় গাছের মূলে *Rhizobium* নডিউল সৃষ্টি করে সেখানে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।
- **ফলন বৃদ্ধি:** জমিতে কতিপয় ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন ৩১.৮% ও গমের উৎপাদন ২০.৮% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- **পতঙ্গনাশক:** বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বর্তমানে কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন: *Bacillus thuringiensis)* ফসলের ক্ষতিকর পতঙ্গ দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩. শিল্পক্ষেত্রে

- **দুগ্ধ শিল্পে:** *Streptococcus lactis, Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুধ থেকে দই, মাখন, পনির, ঘোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- **পাট শিল্পে:** *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পাট পচিয়ে সেখান থেকে আঁশ পৃথক করা হয়।
- **চামড়া শিল্পে:** ট্যানারিতে চামড়া থেকে লোম পৃথক করা এবং চামড়াকে নমনীয় করতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- **চা, কফি, তামাক শিল্পে:** ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এর ফলে বিশেষ স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি ঘটে।
- **রসায়ন শিল্পে:** *Clostridium acetobutylicum* নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে শর্করা হতে অ্যাসিটোন ও অ্যালকোহল তৈরি হয়। *Acetobacter xylium-* এর সাহায্যে অ্যালকোহল থেকে ভিনেগার এবং *Bacillus lacticacidi* দিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে ভিটামিন B_2, B_{12} এবং সেলুলেজ, প্রোটিয়েজ প্রভৃতি এনজাইম পাওয়া যায়। এমনকি রন্ধন শিল্পের টেস্টিংসল্ট তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

৪. বিবিধক্ষেত্রে

- **মানব শরীরে:** মানুষের অন্ত্রে *Escherichia coli* এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া বাস করে এবং ভিটামিন বি$_{২}$, ভিটামিন-কে, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি প্রস্তুত ও সরবরাহ করে।

CamScanner

- **গবাদি পশুর পাকস্থলিতে:** গবাদি পশুর পাকস্থলিতে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ নিঃসৃত করে যা ঘাস, খড় প্রভৃতি হজমে ব্যবহার হয়।
- **পরিবেশ দূষণ রোধে:** মৃত জীবদেহ (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব), ময়লা আবর্জনা, মলমূত্র, বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক দ্রব্য দ্রুত রূপান্তর করে। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ব্যাকটেরিয়াকে প্রকৃতির ঝাড়ুদার বলে। *Zooglea ramigera* ব্যাকটেরিয়াকে সিউয়েজ পরিশোধনে ব্যবহার হয়।
- **বায়োগ্যাস উৎপাদনে:** বায়োগ্যাস প্লান্টে জৈব-রাসায়নিক রূপান্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন: *Bacillus, Clostridium, E.coli, Syntrophomonas, Methanococcus* প্রভৃতি।
- **জিন প্রকৌশলে:** বংশগতির গবেষণা ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে জিন স্থানান্তরে বাহক হিসেবে ব্যাকটেরিয়া বিশেষ করে *Agrobacterium tumefaciens, Escherichia coli* ব্যবহার হয়।
- **তেল অপসারণে:** সমুদ্রের পানি থেকে তেল অপসারণে এক প্রকার তেল খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন– *Pseudomonas aeruginosa, Nocardia*।

অপকারিতা (Disadvantage)

১. **মানুষের রোগ সৃষ্টি:** মানুষের বহু সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। যেমন— কলেরা – *Vibrio cholerae*, টাইফয়েড জ্বর – *Salmonella typhosa*, মেনিনজাইটিস – *Escherichia coli*, যক্ষ্মা – *Mycobacterium tuberculosis*, সিফিলিস – *Treponema pallidum*, ধনুষ্টংকার – *Clostridium tetani*, কুষ্ঠ – *Mycobacterium leprae*, ব্যাসিলারি আমাশয় (রক্ত আমাশয়) – *Shigella dysenteriae*. নিউমোনিয়া– *Diplococcus pneumoniae* প্রভৃতি।

যৌন সংক্রামক রোগ (Sexually transmitted diseases; STD): মানুষের কতকগুলো রোগ যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে অপরের দেহে ছড়ায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো গনোরিয়া (*Neisseria gonorrhoeae*), সিফিলিস (*Treponema pallidum*) ও ক্ল্যামাইডিয়া (*Chlamydia trachomatis*)।

২. **গবাদি পশুর রোগ সৃষ্টি:** ব্যাকটেরিয়া গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- গরু-মহিষের যক্ষ্মা – *Mycobacterium bovis*, গরু-মহিষের অ্যানথ্রাক্স – *Bacillus anthracis*, হাঁস-মুরগির কলেরা – *Bacillus avisepticus*.

৩. **উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি:** ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে ফলন উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয় এমনকি উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায়। যেমন—

লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ– *Xanthomonas citri*, ধানের লিফ ব্লাইট রোগ– *Xanthomonas oryzae*, বেগুনের উইল্ট রোগ– *Pseudomanas solanacearum*, আখের আঠাঝরা রোগ– *Xanthomonas veasculorum*, তুলার কৌণিক লিফ স্পট রোগ– *Xanthaomonas malvacearum*, আলুর নরম পচা রোগ- *Erwinia carotovora*.

৪. **খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টকরণ:** *Clostridium, Pseudomonas*- সহ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া টাটকা অথবা সংরক্ষিত মাছ, মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফলমূল, শাক-সবজি ও সকল প্রকার তৈরি খাবার পচিয়ে খাওয়ার অনুপযুক্ত করে থাকে। এমনকি এতে উৎপন্ন বটুলিন (*Clostridium botulinum*) নামক টক্সিনে মানুষের মৃত্যু (botulism) ঘটতে পারে।

৫. **মাটির উর্বরতা হ্রাসকরণ:** *Pseudomonas, Bacillus denitrificans* ব্যাকটেরিয়াগুলো মাটিস্থ নাইট্রেট ও নাইট্রাইট যৌগ ভেঙে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে রূপান্তর করায় মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

৬. **পানি দূষণ:** কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো রোগীর মলের মাধ্যমে পানি দূষিত করে। ঐ পানি দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার ঘটে ও রোগের সংক্রমণ ঘটায়।

৭. **জীবাণু বোমা:** যুদ্ধে ক্ষতিকারক জীবাণু বোমার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়, যা মানব সভ্যতার জন্য চরম হুমকিস্বরূপ।

৮. **গৃহস্থালীয় ব্যবহৃত বস্তুর ক্ষতি:** কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ঘরে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, জামাকাপড় এমনকি চামড়াজাত দ্রব্যের ক্ষতি করে থাকে।

CamScanner

পাঠ ১১

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ: ধানের ব্লাইট বা ধ্বসা
Bacterial Disease: Blight of Rice

ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর পরজীবী হিসেবে আবাদি ফসলের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদ্ভিদে সাধারণত ব্লাইট, উইল্ট (wilt), গল (gall) ও রট (rot) রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই পাঠে ব্যাকটেরিয়াঘটিত বিভিন্ন রোগের মধ্যে **ধানের ব্লাইট** রোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৪.১১ ধানের ব্লাইট রোগ (Blight Disease of Rice)

ভারত, জাপান, ফিলিপাইন, চীন, মেক্সিকোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলে ধানের ব্লাইট (ধ্বসা) রোগের প্রকোপ দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং এ কারণে প্রতি বছর প্রচুর ফসলহানী ঘটে। গাছের পাতা, ফুল ও কাণ্ডের টিস্যুর ক্ষয়প্রাপ্তি বা মারা যাওয়াকে ব্লাইট বলে। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়। Takaeshi ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়।

৪.১১.১ রোগের জীবাণু (Pathogen/Causal organism)

এ রোগের কারণ *Xanthomonas oryzae* নামক দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া। এরা মনোব্যাসিলাস, কদাচিৎ ২টি একত্রে থাকে। এরূপ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ, বায়বীয় প্রকৃতির এবং একক ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট (monotrichous)। এদের ক্যাপসুল তৈরি হয় না। অ্যাগার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া গোলাকার, মসৃণ, মোমের ন্যায় হলুদাভ ও চকচকে কলোনি উৎপন্ন করে। এরা বিভিন্ন ঘাস ও বন্য ধানকে বিকল্প পোষক হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

৪.১১.২ রোগের লক্ষণ (Disease Symptoms)

১. প্রাথমিক পর্যায়ে পাতার কিনারা বা প্রধান শিরা বরাবর ৫-১০ মি.লি. লম্বা ভেজা দাগ দেখা দেয়।
২. ক্রমে পাশাপাশি দাগগুলো যুক্ত হয়ে সাদা বা হলদে ডোরা সৃষ্টি করে।
৩. ক্ষতস্থানের উপরে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত পদার্থ ছোট বিন্দু আকারে জমা হয়।
৪. নিঃসৃত পদার্থ ক্রমে শুকিয়ে শক্ত হলদে বা লালচে আঠালো দানায় পরিণত হয়।
৫. আক্রান্ত পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মারা যায়।
৬. ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।
৭. আক্রান্ত গাছের অধিকাংশ ধানই চিটায় পরিণত হয়।
৮. অনেক সময় তীব্র আক্রমণে ধানের চারা ঢলে পড়ে।
৯. ধানের শিষে কোনো ফলন হয় না।

চিত্র-৪.১৮: ধানের ব্লাইট রোগ

৪.১১.৩ রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার (Origin and Spreading)

রোগাক্রান্ত বীজ, রোগাক্রান্ত খড়, জমিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি উৎস হতে রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। বাতাসের দ্বারা রোগ জীবাণু বিস্তার লাভ করে। পাতা বা শিরার ক্ষতস্থান অথবা প্রাকৃতিক রন্ধ্র পথে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। আক্রান্ত গাছের পরিবহন কলাগুচ্ছ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পূর্ণ থাকে। জমিতে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ বেশি হলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। চারা আক্রান্ত হলে রোপনের পর রোগ ঘনীভূত হয়। মেঘলা ঝড়ো আবহাওয়া ও ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রা রোগ সংক্রমণের জন্য অনুকূল।

৪.১১.৪ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় (Prevention and Remedies)

১. রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ চাষ করা হলো সবচেয়ে কার্যকরী।
২. ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে যখন গাছ আক্রান্ত হবে।
৩. বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।
৪. চারাগাছের পাতা রোপণের সময় ছাঁটাই করা যাবে না।

CamScanner

৫. পরিত্যক্ত খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে।
৬. অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা করলে বীজতলায় পানি কম জমবে, চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।
৭. নাইট্রোজেন সার এর ব্যবহার কমাতে হবে।
৮. ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
৯. এছাড়া ধানের খড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরিয়ে জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
১০. বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
১১. ব্লিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়। কারণ বীজ রোগ-জীবাণুর প্রধান বাহন।
১২. বীজ বপনের বা চারা রোপনের পূর্বে জমিকে উত্তমরূপে শুকাতে হবে প্রয়োজনে জমির শুকনা আবর্জনা বা খড় পুড়িয়ে দিতে হবে।

বাড়ির কাজ

নিকটস্থ ধানক্ষেত থেকে ব্লাইট আক্রান্ত ধান গাছের নমুনা সংগ্রহ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ এবং তা পাঠ্য বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।

পাঠ ১২

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ: কলেরা
Bacterial Disease: Cholera

৪.১২ কলেরা (Cholera)

কলেরা পানি ও খাদ্যবাহিত একটি সংক্রামক রোগ যা অত্যন্ত মারাত্মক। সুচিকিৎসার সাহায্যে রোগটি সহজেই নিরাময় করা যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করলে রোগ মুক্ত থাকা যায়। বিশ্বে প্রতি বছর ১,০০,০০০ লোক এ রোগের কারণে মারা যায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেও এ রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। এর কারণ হিসেবে ১৯৬৬ হতে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বায়োটাইপ-*Vibrio cholerae* O1 এবং ১৯৯৩ সালে সেরোটাইপ-*V. cholerae* O139-কে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে সেগুলো বাংলাদেশে অনুপস্থিত। বিভিন্ন ধরনের কলেরার মধ্যে **এশিয়াটিক কলেরা** সবচেয়ে মারাত্মক।

চিত্র-৪.১৯: কলেরা জীবাণু

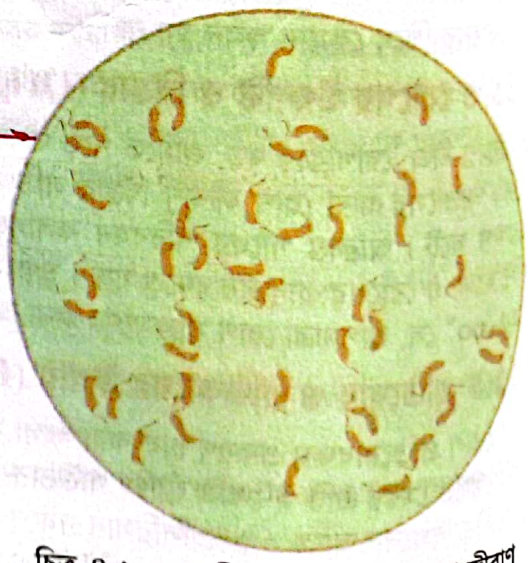

চিত্র-৪.২০: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট কলেরা জীবাণু

৪.১২.১ রোগের কারণ (Reason)

Vibrio cholerae নামক গ্রাম নেগেটিভ, কমাকৃতির ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। এর দৈর্ঘ্য ১-৫ মাইক্রন, প্রস্থ ০.৪-০.৬ মাইক্রন এবং একক ফ্লাজেলাযুক্ত (monotrichous)। রোগীর মল বা বমি দিয়ে জীবাণু বিস্তার লাভ করে এবং খাদ্য বা পানি গ্রহণের ফলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। রোগজীবাণু অন্ত্রে প্রবেশের ১-৫ দিনের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। **রবার্ট কচ** সর্বপ্রথম কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

CamScanner

৪.১২.২ রোগের লক্ষণ (Symptom)

(১) ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে নিঃসৃত এন্টারোটক্সিন জাতীয় **কলেরাজেন** (choleragen) নামক বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় অন্ত্রের প্রাচীরে ব্যথাসহ ক্ষত সৃষ্টি হয়। (২) চাল ধোয়া পানির মতো বার বার পায়খানা হতে থাকে। এ জন্য রোগীর দেহ থেকে প্রচুর পানি ও লবণ নিঃসরণ ঘটে। (৩) পানির অভাবে রোগী ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হয়। (৪) রক্তচাপ হ্রাস পায়, শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় ও হাত পায়ের পেশি কুঁকড়ে আসতে থাকে। (৫) রোগী প্রচণ্ড পিপাসা অনুভব করে এবং চোখ গর্তে বসে যায়। (৬) এ রোগের কারণে রক্ত ঘন হয়ে আসে ও মূত্র তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। (৭) এক পর্যায়ে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে এবং অনিবার্য মৃত্যু ঘটে। (৮) ঘন ঘন বমি হতে থাকে। (৯) রোগীর শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং অস্থিরতা প্রকাশ পায়। (১০) রোগীর শরীরের চামড়া শুষ্ক হয়ে উঠে এবং ঢিলা হয়ে যায়। (১১) রোগীর শরীরে সোডিয়াম আয়নের অভাব দেখা দিতে পারে।

৪.১২.৩ প্রতিকারের উপায় (Remedy)

দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে কলেরা রোগ নিরাময় সহজ হয়। সুচিকিৎসার অভাবে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ৫০ ভাগ মারা যায়। কলেরার কার্যকর চিকিৎসা বেশ সহজ ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ। কলেরা রোগ প্রতিকারে যে সকল পদক্ষেপগুলো দ্রুত গ্রহণ করতে হবে তা হলো—

১. রোগ লক্ষণ দেখার সাথে সাথে রোগীকে দ্রুত প্রচলিত খাবার স্যালাইন (ওরাল স্যালাইন) খাওয়াতে হবে। ঘন ঘন খাবার স্যালাইন খাওয়ার ফলে শরীরে পানি ও লবণের ঘাটতি দূর হয় এবং দ্রুত রোগ নিরাময় ঘটে।

২. ওরাল স্যালাইন খেতে অপারগ হলে অর্থাৎ রোগীর অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন জাতীয় তরল **আইভি ফ্লুইড** (intravenous fluid) প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় প্রতিনিয়ত রোগীর রক্তচাপ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

৩. খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে আইভি ফ্লুইডের সাথে অথবা পৃথকভাবে টেট্রাসাইক্লিন, এরিথ্রোমাইসিন বা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করাতে হবে।

৪.১২.৪ প্রতিরোধের উপায় (Prevention)

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকর —

১. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা; প্রয়োজনে পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করা।
২. পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।
৩. খাদ্য তৈরির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও পচা, বাসি বা খোলা খাবার পরিহার করা।
৪. খাবারে যাতে মাছি বা কীটপতঙ্গ না বসতে পারে তার জন্য সবসময় খাবার ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা।
৫. রোগীর বমি বা পায়খানা যাতে পুকুর, নদী বা উন্মুক্ত জলাশয়ের পানিতে না মিশে যায় তার ব্যবস্থা করা।
৬. সর্বোপরি খাবার আগে ও পায়খানার পরে সাবান, হ্যান্ডওয়াশ বা ছাই দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
৭. অপরিশোধিত কাঁচা শাকসবজি খাওয়া পরিহার করতে হবে, রাস্তার পাশের উন্মুক্ত দোকানের খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে।
৮. রোগীকে সুস্থ ব্যক্তিদের নিকট থেকে আলাদা থাকতে হবে।
৯. শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ে কলেরার টিকা দিতে হবে।
১০. স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে।

দলীয় কাজ

১. সকল শিক্ষার্থী ৫-৭ জনের দল গঠন করো। প্রতি দলের শিক্ষার্থীগণ কলেরা রোগের কারণ ও প্রতিকারমূলক শ্লোগান ও চিত্র সংবলিত পোস্টার তৈরি করো।
২. তোমার এলাকায় কলেরা আক্রান্ত রোগীর নিকট থেকে নমুনা সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করো।

CamScanner

পাঠ ১৩

ব্যবহারিক: ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ (নমুনা: টক দই)

তত্ত্ব: ব্যবহারিক অণুজীববিজ্ঞানে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাকটেরিয়া অতিক্ষুদ্র, এককোষী ও অর্ধস্বচ্ছ হওয়ায় বিশেষভাবে রঞ্জিত করে একে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি: টক দই, টেস্টটিউব, গ্লাস স্লাইড ও কভারগ্লাস, ট্রান্সফার লুপ, স্পিরিট ল্যাম্প, মার্কার কলম, ব্লটিং পেপার, ১% ক্রিস্টাল ভায়োলেট বা স্যাফ্রানিন দ্রবণ, ইমালশন অয়েল ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কার্যপদ্ধতি: ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য নিচের ধাপসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুসরণ করা হয়। যথা—

১. **নমুনার সাসপেনশন তৈরিকরণ:** ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য নমুনা হিসেবে টক দই ব্যবহার করা হয়। সামান্য নমুনা একটি টেস্টটিউবে নিয়ে তাতে ৩-৪ গুণ পাতিত পানি যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে টেস্টটিউবটি কিছুক্ষণ (১০-১৫ মিনিট) স্থির অবস্থায় রাখি। এরপর উপরের স্বচ্ছ অংশ সংগ্রহ করে সাসপেনশন হিসেবে ব্যবহার করি।

২. **স্লাইড প্রস্তুতকরণ:** একটি পরিষ্কার শুকনো নতুন কাঁচের স্লাইড নিয়ে এর মাঝে মার্কার কলম দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি। এবার স্লাইডটি উল্টিয়ে ঐ বৃত্তের মাঝে এক ফোঁটা সাসপেনশন নিয়ে লুপের সাহায্যে ছড়িয়ে পাতলা স্মিয়ার তৈরি করে বাতাসে স্লাইডটি শুকিয়ে নেই। এরপর স্লাইডটি স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর দিয়ে কয়েকবার চালনা করে হাতের তালুর সাহায্যে উত্তপ্ত স্লাইডটি শীতল করি। এভাবে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো স্লাইডের সাথে শক্ত ভাবে আটকে যাবে। এ পদ্ধতিকে **ফিক্সেশন** বলে।

৩. **রঞ্জিতকরণ:** ব্যাকটেরিয়া কোষগুলোকে দৃশ্যমান করার জন্য রঞ্জিত করার প্রয়োজন হয়। ক্রিস্টাল ভায়োলেট বা স্যাফ্রানিন দ্রবণ ব্যবহার করে সহজে ব্যাকটেরিয়া কোষ রঞ্জিত করা যায়। স্মিয়ারের উপর কয়েক ফোঁটা রঞ্জক (ক্রিস্টাল ভায়োলেট ১% দ্রবণ বা স্যাফ্রানিন ১% দ্রবণ) দিয়ে স্মিয়ার ঢেকে দেই এবং ৪—৫ মিনিট অপেক্ষা করি। এরপর ট্যাপের পানির অল্প ধারায় বা বিকারে রাখা পরিষ্কার পানিতে স্লাইডটি আলতোভাবে ধুয়ে ফেলি। এভাবে অতিরিক্ত রং মুক্ত স্লাইডটি ব্লটিং পেপারের সাহায্যে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করি। ফ্যানের বাতাসে স্লাইডটি শুকিয়ে নেই।

৪. **পর্যবেক্ষণ:** শুষ্ক ও রঞ্জিত স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে বৃত্ত চিহ্নিত স্থানটি প্রথমে নিম্নশক্তি অভিক্ষেপে ও পরে উচ্চ শক্তি অভিক্ষেপে (যথাক্রমে ৬০০X ও ১০০০X) পর্যবেক্ষণ করি। উচ্চ শক্তি অভিক্ষেপে পর্যবেক্ষণের সময় ইমালশন অয়েল যোগ করা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বেগুনি বর্ণের ক্ষুদ্র দণ্ডাকার বা গোলাকার কোষ এককভাবে অথবা গুচ্ছাকারে দেখতে পাওয়া যাবে।

শনাক্তকরণ: দণ্ডাকার কোষগুলো ব্যাসিলাস জাতীয় ও গোলাকার কোষগুলো কক্কাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া, যা টক দই এ উপস্থিত ছিল।

জেনে রাখো

DNA রঞ্জিতকরণে ব্যবহার করা হয় Feulgen stain।

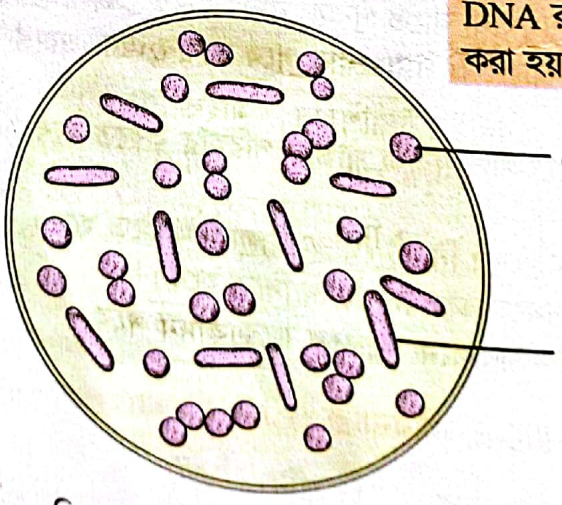

চিত্র-৪.২১: ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ

বি:দ্র: দই এর পরিবর্তে লিগুম জাতীয় (শিম বা ধঞ্চে) গাছের মূলের নডিউল এর নির্যাস হতে সাসপেনশন তৈরি করে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

CamScanner

পাঠ ১৪

ম্যালেরিয়ার পরজীবী: প্লাজমোডিয়াম
Parasite of Malaria : *Plasmodium*

৪.১৩ প্লাজমোডিয়াম (*Plasmodium*)

৭৫ কোটি বছর পূর্বে প্রোটেরোজোইক মহাযুগের শেষ দিকে এসে প্রথম প্রোটোজোয়া জাতীয় প্রাণীর উন্মেষ ঘটে। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু এ জাতীয় একটি সদস্য। ম্যালেরিয়া (malaria) শব্দের অর্থ **দূষিত বায়ু** যা দুটি ইটালীয় শব্দ থেকে এসেছে- mal (দূষিত) এবং aria (বাতাস)। পতঙ্গবাহী প্রোটোজোয়াজনিত বিভিন্ন রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া সবচেয়ে মারাত্মক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৫১.৫ কোটি নারী, পুরুষ ও শিশু এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং এর দুই-তৃতীয়াংশই সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলের অধিবাসী। গ্রীষ্মপ্রধান ট্রপিক্যাল ও নাতিশীতোষ্ণ সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে এ রোগ এন্ডেমিক আকারে দেখা যায়। বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার প্রভৃতি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে পরিগণিত। ১৮৮০ সালে ফরাসী ডাক্তার **চার্লস লেভেরন** ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু হিসেবে *Plasmodium* মানুষের রক্তে দেখতে পান। **স্যার রোনাল্ড** রস ১৮৯৭ সালে অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকীকে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেন।

প্রোটোজোয়া পর্বের পরজীবী *Plasmodium*-এর চারটি প্রজাতি মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। যথা: *P. vivax, P. ovale, P. malariae* ও *P. falciparum*। এ চার প্রজাতির মধ্যে *P.vivax* এর বিস্তৃতিই সবচেয়ে বেশি।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (Levin *et al* . 1980)

জগৎ : Protista
উপজগৎ : Protozoa
পর্ব : Apicomplexa
শ্রেণি : Sporozoa
বর্গ : Haemosporidia
গোত্র : Plasmodiidae
গণ : *Plasmodium*

৪.১৩.১ প্লাজমোডিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of *Plasmodium* Species)

বৈশিষ্ট্য	*P. vivax*	*P. ovale*	*P. malariae*	*P. falciparum*
সৃষ্ট রোগ	বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	মাইল্ড টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	কোয়ার্টার্ন ম্যালেরিয়া	ম্যালিগনেন্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া বা সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া
সুপ্তকাল	১২-২৫ দিন	১১-১৬ দিন	১৫-৩০ দিন	৮-২৫ দিন
অযৌন চক্র	৪৮ ঘণ্টা	৪৮ ঘণ্টা	৭২ ঘণ্টা	৩৬-৪৮ ঘণ্টা সমন্বয়হীন
জ্বর পুনরাবর্ত কাল	একদিন পর পর	একদিন পর পর	প্রতি ৩য় দিন	অনিয়মিত

৪.১৩.২ প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্র (Life Cycle of *Plasmodium*)

Plasmodium এর জীবনচক্র বেশ জটিল। এটি সম্পন্ন করতে দুটি ভিন্ন পোষকের প্রয়োজন হয়। যেমন- অ্যানোফিলিস জাতীয় **স্ত্রী মশকী ও মানুষ**। এখানে মশকী **নির্দিষ্ট পোষক** (definite host) আর মানুষ **মাধ্যমিক পোষক** (intermediate host) হিসেবে ব্যবহার হয়। এখানে মশকীর দেহে গ্যামিটোগনি (বা যৌন জনন) আর মানুষের দেহে **শাইজোগনি (বা অযৌন জনন)** সম্পন্ন হয়। নিচে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ আলোচনা করা হলো—

CamScanner

মানুষের দেহে প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্র (Life Cycle of *Plasmodium* in Human Body)

রোগজীবাণুবাহী অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকী যখন কোনো সুস্থ মানুষকে দংশন করে, তখন মশকীর লালার সাথে রোগ জীবাণুর স্পোরোজোয়েট মানবদেহে প্রবেশ করে। মানবদেহে রোগজীবাণুর অযৌন চক্র সম্পন্ন হয়। এ পর্যায়কে **সাইজোগনি** (schizogony) বলে। প্রথম পর্যায়ে যকৃতে ও পরবর্তী পর্যায়ে লোহিত কণিকায় অযৌন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। একে যথাক্রমে **হেপাটিক সাইজোগনি** (hepatic schizogony) ও **এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি** (erythrocytic schizogony) বলে।

হেপাটিক সাইজোগনি

মানুষের যকৃতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর যে অযৌন চক্র সম্পন্ন হয় তাকে হেপাটিক সাইজোগনি বলে। হেপাটিক সাইজোগনি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত- (ক) **প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি** (pre-erythrocytic schizogony) ও (খ) **এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি** (exo-erythrocytic schizogony)।

ক. প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি: মশকীর লালারসের সাথে মানবদেহে প্রবেশের পর রক্তরসে বাহিত হয়ে স্পোরোজোয়েটগুলো যকৃত কোষে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্পোরোজোয়েট এককোষী, মাকুর ন্যায় দু'প্রান্ত সূঁচালো ও ঈষৎ বাঁকা। যকৃতে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজোয়েট গোলাকার হয়। এ অবস্থাকে **ক্রিপ্টোজোয়েট** (cryptozoite) বলে। প্রতিটি ক্রিপ্টোজোয়েটের নিউক্লিয়াস কয়েক দিনে পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে বহুসংখ্যক (প্রায় ১,২০০) ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস গঠন করে। এ অবস্থাকে **সাইজন্ট** (schizont) বলে। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম যুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র, গোলাকার **ক্রিপ্টোমেরোজোয়েট** (cryptomerozoite) উৎপন্ন করে। ক্রিপ্টোমেরোজোয়েট সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে ও যকৃতের অভ্যন্তরে সাইনুয়েড ভেসেলে অবস্থান গ্রহণ করে। এভাবে সৃষ্ট ক্রিপ্টোমেরোজোয়েট কয়েক বার সাইজোগনি প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি করে পরে রক্তে ফিরে আসে। অনেক সময় স্পোরোজোয়েট যকৃতে প্রবেশের পর কয়েক মাস পর্যন্ত অবিভক্ত থেকে পরবর্তীতে মেরোজোয়েট উৎপন্ন করে। এই অবিভক্ত স্পোরোজোয়েট অবস্থাকে **হিপ্নোজোয়েট** (hypnozoite) বলে।

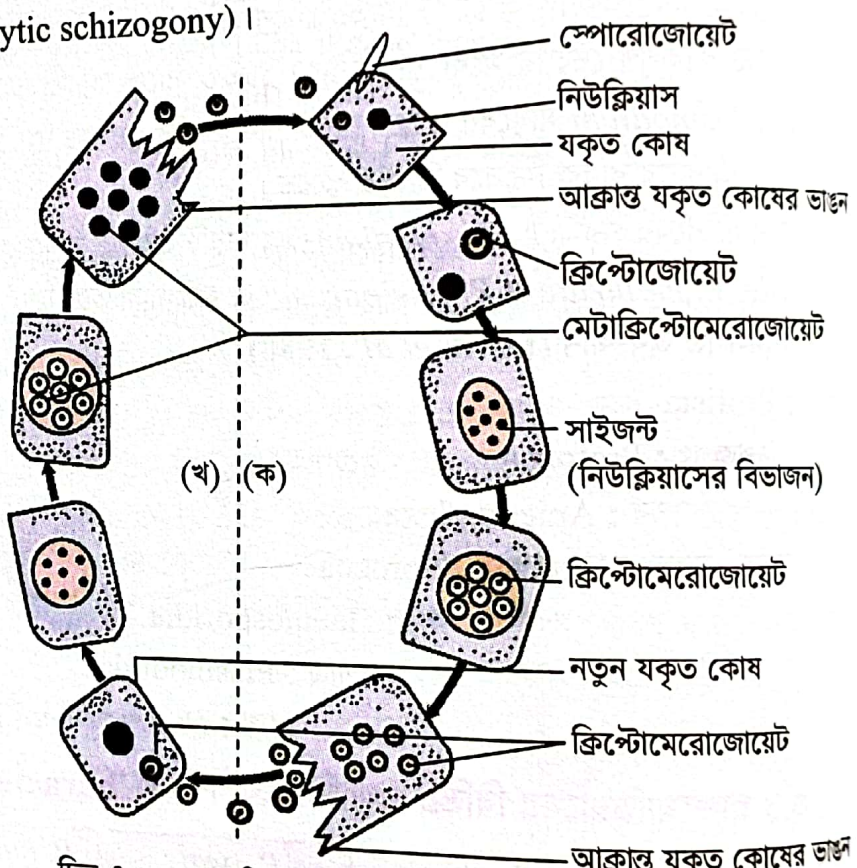

চিত্র-৪.২২: হেপাটিক সাইজোগনি (৭-১০ দিন)

খ. এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি: প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ে উৎপন্ন ক্রিপ্টোমেরোজোয়েট নতুন করে যকৃত কোষ আক্রমণ করে ও এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে। এ পর্যায়ে ক্রিপ্টোমেরোজোয়েট নিউক্লিয়াসটি বার বার বিভক্ত হয়ে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়াস যুক্ত **সাইজন্ট দশা** (schizont condition) উৎপন্ন করে। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম আবৃত অবস্থায় **মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট** (metacryptozoite) উৎপন্ন করে। পূর্বের ন্যায় ক্রিপ্টোমেরোজোয়েটগুলো সাইজন্ট প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসে ও নতুন যকৃত কোষ আক্রমণ করে। এভাবে বার বার দু'প্রকার মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট উৎপন্ন হতে থাকে এবং জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বড় আকারের

CamScanner

ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট নতুন যকৃত কোষ আক্রমণ করে ও ছোট আকারের মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট রক্তরসে প্রবেশ করে। তবে বছরের পর বছর ধরে ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোজোয়েট যকৃত কোষে অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যেতে পারে। স্পোরোজোয়েট থেকে মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট অবস্থায় পৌছাতে প্রায় ৭-১০ দিন সময় লাগে।

এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি

হেপাটিক সাইজোগনির পর ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের লোহিত কণিকা আক্রমণ করে ও সেখানে অযৌন (সাইজোগনি) প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে, যাকে **এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি** বলে।

লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আকারে বড় ও গোল হয়ে **ট্রফোজয়েটে** পরিণত হয়। এসময় ট্রফোজয়েটের কেন্দ্রে একটি গহ্বর উৎপন্ন হয় ও আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে একে রিং এর মতো দেখায়। এ অবস্থাকে **সিগনেট রিং দশা** বলে। সিগনেট রিং আধা ঘণ্টার মধ্যে অ্যামিবার ন্যায় অনিয়মিত ক্ষণপদযুক্ত **অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েটে** (amoeboid trophozoite) পরিণত হয়। এ পর্যায়ে লোহিত কণিকায় দানার ন্যায় **সাফনার্স কণা** দেখা দেয়। কিছু সময় পর ক্ষণপদ বিলুপ্ত হয় ও জীবাণু গোলাকার **সাইজন্টে** পরিণত হয়। এর সাইটোপ্লাজমে **হিমোজয়েন** (haemozoin) নামক বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ জমা থাকে। সাইজন্ট লোহিত কণিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে অবস্থান করে ও বহু বিভাজন প্রক্রিয়ায় **মেরোজোয়েট** (merozoite) উৎপন্ন করে। মেরোজোয়েটগুলো ফুলের পাপড়ির মতো বিন্যস্ত থাকে, যা **রোজেট দশা** (rosette phase) নামে পরিচিত। রক্তকণিকা ভেঙে মেরোজোয়েট বেরিয়ে আসে ও পুনরায় নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। প্রজাতিভেদে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সমাপ্ত হতে ৪৮—৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। লোহিত কণিকা ধ্বংস হবার কারণে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা (anaemia) দেখা দেয়। লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের পর বিষাক্ত হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকা ভেঙে মেরোজোয়েট যখন বেরিয়ে আসে তখন হিমোজয়েন রক্ত রসে মিশে যায় ও কোষের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজোয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য শ্বেতকণিকা অতিরিক্ত **পাইরোজেন** (pyrogen) নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। এর ফলে রোগীর দেহে কম্পন দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসে।

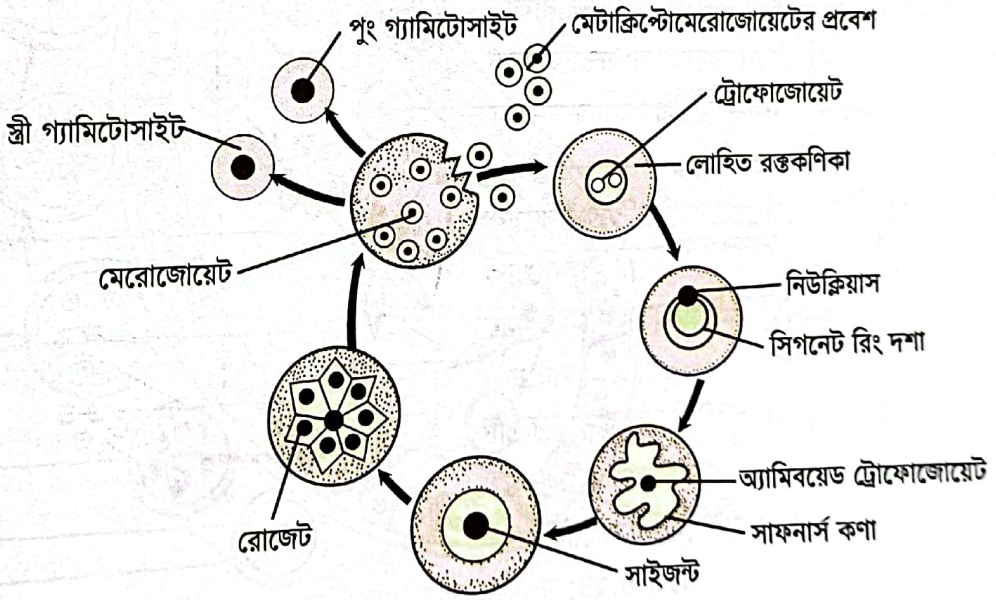

চিত্র-৪.২৩: এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (৪৮-৭২ ঘণ্টা)

পর পর কয়েকবার সাইজোগনির পর বেশ কিছু মেরোজোয়েট রূপান্তরিত হয়ে ম্যাক্রো ও মাইক্রোগ্যামিটোসাইটে (macro- & micro-gametocyte) পরিণত হয় ও রক্তে ভাসতে থাকে। এরূপ গ্যামিটোসাইটের (মানব রক্তে) আর কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মশকী দ্বারা গৃহীত হলে এদের গ্যামিটোগনি (যৌন জনন) শুরু হয়। তবে মানুষের রক্তে গ্যামিটোসাইট গুলো ৭ দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে ও পরে নষ্ট হয়ে যায়।

একক কাজ

... তুলনা করো।

পাঠ ১৫

মশকীর দেহে প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্র
Life Cycle of *Plasmodium* in Mosquito

৪.১৪ মশকীর দেহে প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্র (Life Cycle of *Plasmodium* in Mosquito)

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর যৌন চক্র সম্পন্ন হয়। মশকীর দেহে ম্যালেরিয়ার যৌন চক্রকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) গ্যামিটোগনি ও (খ) স্পোরোগনি । নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো-

(ক) গ্যামিটোগনি (Gametogony): অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকী যখন রোগাক্রান্ত কোনো রোগীর দেহ থেকে রক্তপান করে তখন রক্তের সাথে জীবাণুর পুং ও স্ত্রী গ্যামিটোসাইট মশকীর পরিপাক নালিতে প্রবেশ করে ও ক্রপে জমা হয়। ক্রপে পাচক রসের ক্রিয়ায় এসময় জীবাণুর অন্য সকল পর্যায় হজম হয়ে যায়। কিন্তু পাচক রসের প্রভাবে গ্যামিটোসাইট হতে গ্যামিট তৈরি হয় ও নিষেকে অংশ গ্রহণ করে। গ্যামিটোগনি প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ–

চিত্র-৪.২৪: মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রের চিত্ররূপ

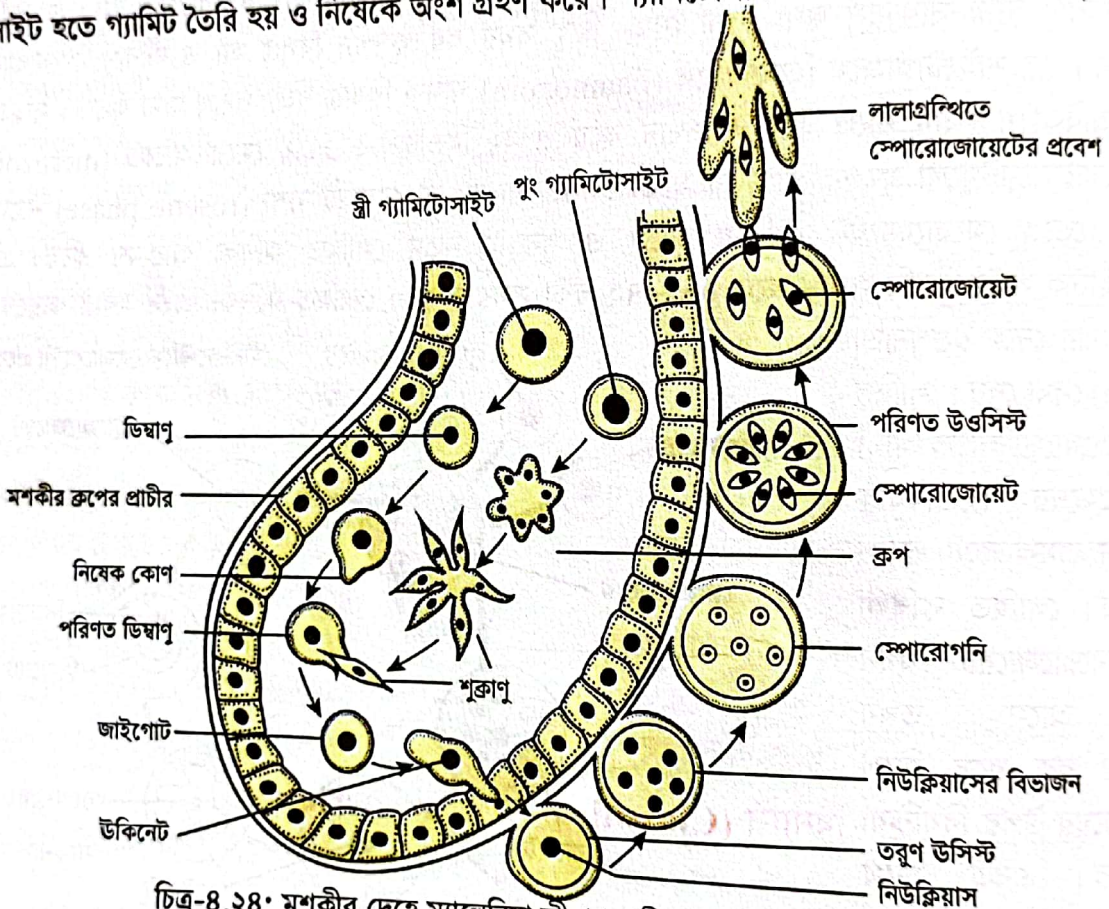

গ্যামিটোজেনেসিস : প্রতিটি মাইক্রোগ্যামিটোসাইট বা পুং গ্যামিটোসাইট হতে এ পর্যায়ে এক্সফ্ল্যাজিলেশন (exflagellation) প্রক্রিয়ায় ৪-৮ পুংগ্যামিট (শুক্রাণু) উৎপন্ন হয়। ম্যালেরিয়া জীবাণুর দেহের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (n), তাই এ পর্যায়ে কোনো মায়োসিস প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। এ প্রক্রিয়ার প্রথমে প্রতিটি মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং সমসংখ্যক অভিক্ষেপ সৃষ্টি হয়। প্রতিটা অভিক্ষেপে একটি করে নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে নিউক্লিয়াসসহ এক একটি অভিক্ষেপ পুংগ্যামিটে পরিণত হয়। প্রতিটি পুংগ্যামিট ফ্ল্যাজেলার মতো অভিক্ষেপ বিশিষ্ট এবং এর প্রসারিত মস্তক অংশে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। মশকীর দেহে ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট বা স্ত্রী গ্যামিটোসাইট স্ফীত হয়ে একটি মাত্র স্ত্রী গ্যামিট (n) বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। নিষেকের সময় পুংগ্যামিট ধারণ করার জন্য স্ত্রীগ্যামিটের এক পাশে সামান্য ফুলে উঠে যাকে নিষেক কোণ বলে। স্ত্রী গ্যামিটের সাইটোপ্লাজম ঘন, উজ্জ্বল নীল বর্ণের ও নিউক্লিয়াস আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট। পুংগ্যামিটের সাইটোপ্লাজম ধূসর নীল ও নিউক্লিয়াস বড়।

CamScanner

নিষেক ও জাইগোট সৃষ্টি : পরিণত স্ত্রীগ্যামিটের চারপাশে অনেকগুলো পুংগ্যামিট সাঁতার কেটে জমা হয় এবং একটি মাত্র পুংগ্যামিট এর ভেতরে প্রবেশ করে এবং নিষেক সম্পন্ন হয়। নিষেকের ফলে স্ত্রীগ্যামিটটি গোলাকার **জাইগোটে** (zygote) পরিণত হয়।

উকিনেট গঠন: রক্ত শোষণের ১২-১৪ ঘণ্টার মধ্যে গোলাকার জাইগোট লম্বাটে সচল **উকিনেট** (ookinete)-এ পরিণত হয়। এরপর মশকীর ক্রপের অন্তঃপ্রাচীর ভেদ করে বহিঃপ্রাচীরের নিচে অবস্থান নেয়। এ সময় উকিনেট পাতলা আবরণীতে আবদ্ধ হয় ও গোলাকার **উসিস্ট** (oocyst) গঠন করে।

(খ) স্পোরোগনি (Sporogony): মশকীয় ক্রপের প্রাচীরে উসিস্টের অযৌন জননকে স্পোরোগনি বলে। উসিস্টের নিউক্লিয়াস এ সময় প্রথমে মায়োসিস ও পরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস (n) গঠন করে। এ সময় উসিস্টের মধ্যে প্রথমে বড় গহ্বর সৃষ্টি হয় ও নিউক্লিয়াসগুলো সাইটোপ্লাজমে সমভাবে ছড়িয়ে থাকে। পরে কেন্দ্রীয় গহ্বরটি বিলুপ্ত হয় ও প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমে আবৃত হয়ে মাকুর ন্যায় লম্বাটে **স্পোরোজোয়েট** (n) গঠন করে। একটি উসিস্টে দশ হাজার পর্যন্ত স্পোরোজোয়েট উৎপন্ন হয়। স্পোরোজোয়েটগুলো উসিস্টের প্রাচীর ভেঙে প্রথমে মশকীর **হিমোসিলে** (haemocoel) বা দেহগহ্বরের রক্তে প্রবেশ করে। এরপর তারা মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী দংশনের অপেক্ষায় থাকে। প্রথম দংশনেই তারা নতুন মানবদেহে প্রবেশ করে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায়।

৪.১৫ ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রে জনুক্রম (Alternation of Generation in Life Cycle of Malaria)

ম্যালেরিয়ার পরজীবী *Plasmodium vivax* হলো প্রোটোজোয়ার এককোষী অন্তঃপরজীবী প্রাণী। এদের জীবনে মানুষ ও অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকী যথাক্রমে মাধ্যমিক পোষক ও নির্দিষ্ট পোষকের দায়িত্ব পালন করে। মানুষের দেহে এদের অযৌন জনন এবং মশকীর দেহে যৌন জনন ঘটে। **কোন জীবের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম বলে।** *Plasmodium vivax*-এর জীবনে সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান।

হ্যাপ্লয়েড জনু (n)

- **স্পোরোজোয়েট দশা:** মশকীর লালাগ্রন্থিতে বিদ্যমান স্পোরোজোয়েট (n) দংশন কালে মানুষের দেহে প্রবেশ করে।
- **হেপাটিক সাইজোগনি:** স্পোরোজোয়েটগুলো যকৃতের কোষে প্রথমে ক্রিপ্টোজোয়েট, পরে সাইজন্ট এবং শেষে ক্রিপ্টোমেরোজোয়েটে পরিণত হয়। এরপর যকৃত কোষ ভেঙে পুনরায় নতুন যকৃত কোষে আক্রমণ করে ও শেষে মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েট-এ পরিণত হয়।
- **এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি:** মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েটগুলো লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং সেখানে মাইক্রোগ্যামিটোসাইট (n) এবং ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট (n) গঠন করে।

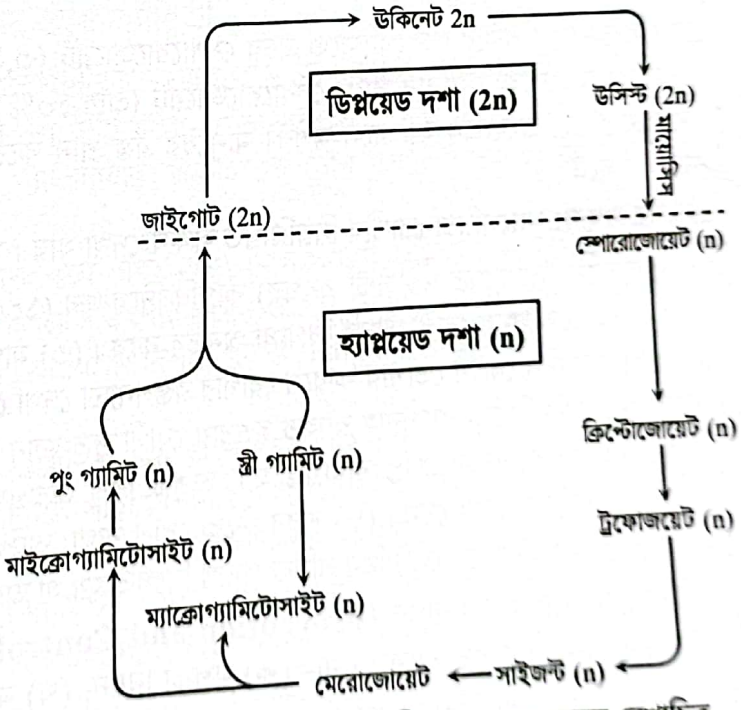

চিত্র-৪.২৫: ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে জনুক্রমের রেখাচিত্র

ডিপ্লয়েড জনু (2n)

- **জাইগোট:** রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে রক্ত শোষণ কালে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট মশকীর পরিপাক নালিতে চলে যায় এবং সেখানে শুক্রাণু (n) ও ডিম্বাণু (n) গঠন করে। এই শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে গঠন করে জাইগোট (2n)।
- **উকিনেট:** জাইগোট লম্বাটে হয়ে উকিনেট (2n) গঠন করে, যা প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে গোলাকার উসিস্টে (2n) পরিণত হয়। এরপর উসিস্ট প্রথমে মায়োসিস এবং পরে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড স্পোরোজোয়েট (n) গঠন করে। এভাবে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায়।

জনুক্রমের তাৎপর্য (Significance of Alternation of Generation)

১. জীবের নতুন প্রকরণ সৃষ্টিতে জনুক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখে।
২. জনুক্রম জীবাণুর বিস্তৃতিতে সহায়তা করে।
৩. জীবাণুর প্রজাতির ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখে জনুক্রম।
৪. জীবাণুর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।
৫. জনুক্রম জীবাণুর জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে।
৬. জনুক্রম জীবে বৈচিত্র সৃষ্টি করে, যা অভিব্যক্তির মূল উপাদান।
৭. নতুন পোষকদেহে সংক্রমণের জন্য জনুক্রম অপরিহার্য।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর সুপ্তাবস্থাকাল বা সুপ্তিকাল (Incubation Period)

পোষকদেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশের সময় থেকে সেই পোষকের দেহে উক্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় **সুপ্তাবস্থাকাল**। যেমন— মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে মানবদেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় জীবাণু প্রবেশের কিছুদিন পর। ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করার সময় থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণগুলো প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে ম্যালেরিয়া রোগের **সুপ্তাবস্থাকাল** (latent period or incubation period) বা **সুপ্তিকাল** বলে। সুপ্তিকাল সাধারণভাবে কোনো রোগের জন্য নির্দিষ্ট।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির সুপ্তাবস্থার সময়কাল:

(i) *Plasmodium vivax*- ১২-২০ দিন
(ii) *Plasmodium falciparum*-৮-১৫ দিন
(iii) *Plasmodium ovale*-১১-১৬ দিন
(iv) *Plasmodium malariae*- ১৮-৪০ দিন

রোগ সংক্রমণ: মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রচুর স্পোরোজোয়েট (৩,২৬,০০০ টি) জমা হয়। এ সময় কোনো সুস্থ লোককে দংশন করলে মশকীর লালার সাথে স্পোরোজোয়েট (প্রায় ১০%) মানুষের দেহে প্রবেশ করে। ডিম্বক পরিস্ফুটনের জন্য স্তন্যপায়ীর রক্ত প্রয়োজন হয় বলে মশকী মানুষের রক্ত পান করে এবং এভাবে মশকীর দেহ থেকে মানবদেহে রোগের সংক্রমণ ঘটে।

রোগের লক্ষণ: ম্যালেরিয়া রোগীর নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা—

(১) পালাক্রমে (সাধারণত ৪৮ ঘণ্টা পরপর) কাঁপুনি দিয়ে জ্বর (১০৫°—১০৬° ফা.) আসে ও ধীরে ধীরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। (২) জ্বরের সময় রোগী ভীষণ পিপাসা অনুভব করে। (৩) মাথা ব্যথা, তলপেটে ব্যথা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। (৪) দীর্ঘ দিন রোগে ভোগার কারণে রোগীর রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ও রোগীর প্লীহা বড় হয়ে যায়। (৫) *P. falciparum* আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় রোগী দ্রুত জ্ঞান হারায় ও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (৬) গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত বা শিশুর পূর্ণতা প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়, অপুষ্ট শিশু জন্মগ্রহণ করে। (৭) রোগীর ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য, আহারে অনীহা এবং অনিদ্রা দেখা দেয়। (৮) শুরুর দিকে পেশি ব্যথা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা এবং শীত শীত অনুভূত হয়। (৯) আক্রান্ত রোগীর প্লীহা থেকে লাইসোলেসিথিন নামক পদার্থ নিঃসৃত হয় যা অনেক লোহিত কণিকা ধ্বংস করে।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Prevention and Control of Malaria): ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ তিনটি উপায়ে করা যেতে পারে। যথা- (ক) মশকী নিধন, (খ) মশকী হতে আত্মরক্ষা এবং (গ) চিকিৎসা।

(ক) মশকী নিধন: পরিবেশ হতে মশককুলের বংশ নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কিছু পন্থা অবলম্বন করে এদের বিস্তার রোধ করা যায়—

(i) প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস: বদ্ধ পচা পানিতে ডিম পাড়ে মশকীরা। পরিত্যাক্ত ডোবা, নালা পরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে পানি জমতে না দেয়া, বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে মশকীর বসবাস ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা সম্ভব।

(ii) লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা: মশকীর লার্ভা ও পিউপা দশা পচা পানিতে ডিম ফুটে সৃষ্টি হয়। পানিতে কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিয়ে, বিএইচসি (BHC) ডায়েলড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর

CamScanner

লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। জুভেনাইল হরমোন পানিতে ছিটিয়ে দিলে, লার্ভাগুলোর রূপান্তর ব্যাহত হয়। ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে রূপান্তরিত হতে পারে না।

যে সকল জলাশয়ে লার্ভা বা পিউপা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঐ সকল জলাশয়ে গাপ্পি, কই, খলসে, তেলাপিয়া, পুঁটি, টাকি ইত্যাদি জাতীয় লার্ভিভোরাস মাছ চাষ করলে এরা মশকীর লার্ভা ও পিউপাগুলোকে ভক্ষণ করে। এতে মশকী নিধনের পাশাপাশি পরিবেশও থাকে দূষণমুক্ত।

(iii) পূর্ণাঙ্গ মশককুল নিধন: ফগিং মেশিনের মাধ্যমে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব এতে মশকীকুলকে ধ্বংস করা যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বা রেডিয়েশন এর মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করেও মশা নিধন সম্ভব।

(খ) মশকী হতে আত্মরক্ষা: ঘরের দরজা-জানালায় মশকীরোধী নেট মশারি, ধূপের ধোঁয়া, কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করে মশকী থেকে বাচা যায়।

(গ) চিকিৎসা: ম্যালেরিয়া রোগীর উন্নত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ওষুধ হলো সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন। এ কুইনাইন দ্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি হয়েছে। যেমন- ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোক্লোর, প্যালাড্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ঔষুধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক, নতুবা দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

ম্যালেরিয়া টিকা (Malarial Vaccine): বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র ম্যালেরিয়া ভ্যাক্সিন-*'Mosquirix'* কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৯ সালে স্বীকৃতি দেয়। এ যুগান্তকারী আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছে গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন নামক প্রতিষ্ঠান। *Plasmodium falciparum* জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম এইটি (চার ডোজ সম্পন্ন)। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের শিশুরা এ পরজীবী কর্তৃক সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং এতে এদের মৃত্যুর হারও বেশি। তবে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার প্রভৃতি সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলের দেশগুলো এ রোগের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে রয়েছে বলে পরিগণিত হয়।

ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রে দুটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা

ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রে যে দুটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা হলো- মানবদেহ এবং মশকী।

এদের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট দুটি দশা পরিলক্ষিত হয়। দশা দুটি হলো- যৌন দশা ও অযৌন দশা। এর যেকোনো দশার ব্যত্যয় ঘটলে ম্যালেরিয়ার জীবনচক্র বাধাগ্রস্ত হয়। ম্যালেরিয়ার জীবনচক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানবদেহে সম্পন্ন হয়।

মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে এবং তারা মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি করে। জাইগোট মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ না করে মানবদেহে চলে আসে। অর্থাৎ, দেখা যায় যৌন দশায় পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পোরোজয়েট সৃষ্টির জন্য মশকী পোষকের প্রয়োজন পড়ে।

মশকীর দেহে সৃষ্ট স্পোরোজয়েটগুলো মানবদেহে অযৌন দশায় অংশ নেয়। স্পোরোজয়েটগুলো মানবদেহে প্রথমে যকৃত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণের মাধ্যমে সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করার সময় প্রচুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয় যা যকৃত কোষ ও লোহিত কণিকা থেকে পেয়ে থাকে। মানবদেহের লোহিত কণিকায় অযৌন দশার শেষে গ্যামিটোসাইট সৃষ্টি হয় যারা পরবর্তীতে পুনরায় যৌন দশায় অংশ নেয়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষক অর্থাৎ মানুষ ও মশকীর প্রয়োজন রয়েছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণ

লোহিত কণিকায় ম্যালেরিয়া জীবাণুর অযৌন জননের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রটি প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় একবার সম্পন্ন হয়। এ সময় অসংখ্য মেরোজয়েট রক্তরসে মুক্ত হয়। এ মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য শ্বেত রক্তকণিকা পাইরোজেন নামক এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। রক্তে অতিরিক্ত পাইরোজেনের কারণে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ উদ্দীপিত হয় এবং রক্তনালিকাগুলোকে সংকুচিত করে। ফলে দেহ থেকে অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না এবং কম্পন দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসে। যেহেতু প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন হয়, সেহেতু ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিন অন্তর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।

CamScanner

ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তশূন্যতার কারণ

ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তশূন্যতার প্রধান কারণগুলো হলো—

১. ম্যালেরিয়ার অযৌন জননের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রের শেষে লোহিত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজোয়েটগুলো রক্তরসে বের হয়ে আসে। ফলে লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়। এটি রোগীর রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ।

২. ম্যালেরিয়া রোগীর যকৃত ও প্লীহা স্ফীত হয়ে যায়। অর্থাৎ এদের কার্যক্ষমতা অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে রক্তকণিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. রোগীর প্লীহা থেকে Lysolecithin নামক এক ধরনের পদার্থ নিঃসৃত হয় যা লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস করে।

৪. রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু *heamolysin* নামক এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা লোহিত রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে।

৫. রোগীর খাবারের প্রতি অরুচির কারণে পুষ্টির অভাবে রক্তকণিকা তৈরি হয় না।

দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা ৫-৭ জনের গ্রুপ তৈরি করো। প্রতি গ্রুপের শিক্ষার্থীরা মশার বিস্তার বিষয়ক চিত্র সংবলিত পোস্টার ও প্রতিরোধক শ্লোগান লিখে এলাকায় প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা করো।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

অণুজীব	জীবজগতে অসংখ্য জীব আছে যাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। এরূপ জীবসমূহ সাধারণভাবে অণুজীব নামে পরিচিত। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত।
ভাইরাস	ভাইরাস এর গঠন খুবই সাধারণ এবং এদের দেহ কোষহীন, শুধুমাত্র প্রোটিন নির্মিত ক্যাপসিডে নিউক্লিক অ্যাসিড আবদ্ধ থাকে। এদের দেহে জেনেটিক বস্তু হিসেবে DNA ও RNA থাকে। জীবকোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস শুধু বিভাজন ও জীবনের স্পন্দন দেখায় বলে এরা জীব না জড় সে সম্পর্কে বির্তক রয়েছে।
নিউক্লিওক্যাপসিড	কোনো কোনো ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে যে বিশেষ গঠন তৈরি করে তাকে নিউক্লিওক্যাপসিড বলে। এটা HIV-সহ কতিপয় ক্ষেত্রে দেখা যায়।
প্রিয়ন	প্রিয়ন হলো ভাইরাসের শূন্য প্রোটিন আবরণ, যা মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
ভিরয়েড	ভিরয়েড হলো শুধুমাত্র ক্ষুদ্র RNA দ্বারা গঠিত অতি আণুবীক্ষণিক জীবাণু যা ভাইরাসের মতো বিস্তার লাভ করতে পারে এবং জীবদেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এরা ক্ষুদ্রতম সংক্রামক ক্ষমতাসম্পন্ন অণুজীব। এর কোন সুপ্ত দশা নেই। নগ্ন RNA দিয়ে এর দেহ গঠিত।
লাইসোজেনিক চক্র	ভাইরাস অনেক সময় পোষক কোষে সংখ্যা বৃদ্ধি না করে সুপ্ত অবস্থায় থাকে অথবা পোষক DNA এর সাথে যুক্ত হয়ে অকার্যকর অবস্থায় বিরাজ করে ও পোষক কোষের সাথে প্রভাবিত হয় এবং পোষক কোষের ভাঙ্গন সৃষ্টি করে না। এ অবস্থাকে লাইসোজেনিক পর্যায় বলে। লাইসোজেনিক পর্যায় থেকে এ ভাইরাস পুনরায় লাইটিক পর্যায়ে স্থির হতে পারে।
পরজীবী	যে জীব আজীবন বা জীবনের কোনো এক বা একাধিক পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবদেহের ভেতরে বা বাইরে বাস করে পোষকের ক্ষতিসাধন করে তাকে পরজীবী বলে। যেমন— ম্যালেরিয়া জীবাণু, ইবোলা ভাইরাস ইত্যাদি।

CamScanner

ব্যাকটেরিয়া	ব্যাকটেরিয়া এককোষী প্রোক্যারিওটিক জীব। এদের আকৃতি গোলাকার, দণ্ডাকার, কমাকৃতি বা বক্রদণ্ডের ন্যায়, তবে অনেক ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি পরিবেশের উপর পরিবর্তনশীল। দ্বিবিভাজন বা মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় এদের অযৌন জনন ঘটে। অনেক পরজীবী ব্যাকটেরিয়া মানুষসহ উদ্ভিদ, প্রাণিদেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।
প্লাজমোডিয়াম	*Plasmodium* গণের প্রোটোজোয়া মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। ম্যালেরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এন্ডেমিক রোগ। প্লাজমোডিয়াম এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষক প্রাণীর প্রয়োজন হয়। মানুষের দেহে অযৌন ও মশকীর দেহে এদের যৌনচক্র সম্পন্ন হয়। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ রোধ করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পার্থক্যসমূহ

▶ **ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য**

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয়; এতে সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ও নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয়; এতে সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ও আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস আছে।
ii. এরা অতি আণুবীক্ষণিক।	ii. এরা আণুবীক্ষণিক।
iii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	iii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iv. কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে।	iv. কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
v. এতে বিপাক ক্রিয়া দেখা যায় না এবং কোনো এনজাইমও নেই।	v. এদের বিপাক ক্রিয়ার জন্য এনজাইম আছে।
vi. এদের DNA অথবা RNA যেকোন এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থান করে।	vi. এদের DNA এবং RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড একই সাথে থাকে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।

▶ **লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য**

লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
i. লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সমগ্র ভাইরাস সৃষ্টি হয়।	i. লাইসোজেনিক চক্রে ভাইরাল DNA অণুর প্রতিলিপি গঠিত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভাইরাস সৃষ্টি হয় না।
ii. পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষের দ্রুত বিদারণ ঘটে।	ii. পোষক ব্যাকটেরিয়ার বিদারণ ঘটে না।
iii. আক্রমণের প্রকৃতি তীব্র বা ভাইরুলেন্ট (virulent)।	iii. পোষক কোষের মৃত্যু ঘটে না তাই আক্রমণ মৃদু বা টেম্পারেট (temperate)।
iv. এ চক্রে পোষক DNA বিনষ্ট হয়।	iv. এ চক্রে পোষক DNA এর সাথে যুক্ত হয়েই পোষক DNA এর সাথে সাথে ভাইরাস DNA এর প্রতিলিপি তৈরি হয়।
v. প্রোফায তৈরি হয় না।	v. প্রোফায তৈরি হয়।
vi. ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক রিকম্বিনেশনে কোনো ভূমিকা নেই।	vi. ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক রিকম্বিনেশনে ভূমিকা রাখে।

CamScanner

▶ **RNA ভাইরাস ও DNA ভাইরাস এর মধ্যে পার্থক্য**

RNA ভাইরাস	DNA ভাইরাস
i. সাধারণত দণ্ডাকার বা সূত্রাকার।	i. সাধারণত গোলাকার, বহুভুজাকার, ব্যাঙাচি আকার ও পাউরুটি আকৃতির।
ii. অধিকাংশ RNA ভাইরাস উদ্ভিদ ও সায়ানোফাযকে আক্রমণ করে।	ii. অধিকাংশ DNA ভাইরাস প্রাণী ও ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে।
iii. অধিকাংশ ভাইরাসের RNA একসূত্রক।	iii. অধিকাংশ ভাইরাসের DNA দ্বিসূত্রক।
iv. এরা সাধারণত উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে।	iv. এরা সাধারণত প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি করে।
v. সাধারণত এনভেলপ থাকে না।	v. ক্যাপসিডের বাইরে সাধারণত এনভেলপ থাকে।
vi. এরা বাহক পতঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতস্থানের মাধ্যমে পোষক কোষে প্রবেশ করে।	vi. এরা সাধারণত এন্ডোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় পোষক কোষে প্রবেশ করে।

▶ **ফ্ল্যাজেলা ও পিলির মধ্যে পার্থক্য**

ফ্ল্যাজেলা	পিলি
i. কোষ প্রাচীরের ভিতরের পাদদেশীয় গ্রানিউল থেকে ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি হয়।	i. কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে পিলি সৃষ্টি হয়।
ii. পিলি অপেক্ষা আকারে বড় এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল।	ii. ফ্ল্যাজেলা অপেক্ষা খাটো ও অধিকতর সরু।
iii. সূত্রাকার লম্বা অঙ্গবিশেষ যা Blapheroplast নামক দানা হতে উৎপন্ন হয় এবং কোষ প্রাচীর ভেদ করে বাইরে চলে আসে।	iii. ফাঁপা, দণ্ডাকার, দৃঢ় অঙ্গবিশেষ যা ব্যাকটেরিয়া দেহের উৎপত্তিগত অঙ্গ।
iv. ব্যাকটেরিয়ার কোষে এদের সংখ্যা অনেক কম থাকে।	iv. এদের সংখ্যা অধিক থাকে।
v. ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।	v. পিলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।
vi. ফ্ল্যাজেলা চলনে সাহায্য করে।	vi. পিলি পোষকদেহে সংযুক্তিতে ও কনজুগেশনে সহায়তা করে।

▶ **হেপাটিক সাইজোগনি ও স্পোরোগনির মধ্যে পার্থক্য**

হেপাটিক সাইজোগনি	স্পোরোগনি
i. হেপাটিক সাইজোগনি মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়।	i. স্পোরোগনি মশকীর দেহে সংঘটিত হয়।
ii. এ পর্যায়ে মেরোজাইগোট তৈরি হয়।	ii. এ পর্যায়ে জাইগোট তৈরি হয়।
iii. হেপাটিক সাইজোগনি পর্যায়ে মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট, ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট এবং ক্রিপ্টোজয়েট সৃষ্টি হয়।	iii. এ পর্যায়ে স্পোরোজয়েট ও ঊওসিস্ট সৃষ্টি হয়।
iv. এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রিপ্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস দশায় পরিণত হয়।	iv. এ পর্যায়ে ক্রপের গায়ে সংলগ্ন প্রতিটি ঊওসিস্টের নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।
v. পরিণত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বার বার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পরিণত হয়।	v. ঊওসিস্ট প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম জমা হয় এবং পরে তার চারদিকে কোষ পর্দা দ্বারা গঠিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হয়।
vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ২-৩ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।	vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ১০-১২ দিন প্রয়োজন হয়।

CamScanner

▶ হেপাটিক সাইজোগনি ও এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মধ্যে পার্থক্য

হেপাটিক সাইজোগনি	এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
i. মানুষের যকৃত কোষে এটি সংঘটিত হয়।	i. এটি মানুষের লোহিত কণিকায় সংঘটিত হয়।
ii. হেপাটিক সাইজোগনিতে হিমোজয়েন উৎপন্ন হয় না।	ii. এর শেষ দিকে হিমোজয়েন উৎপন্ন হয়।
iii. সাফনার-এর দানা দেখা যায় না।	iii. সাইজন্টের বাইরে সাফনার-এর দানা দেখা যায়।
iv. ম্যালেরিয়ার অযৌন চক্রের এ পর্যায়ে রোগীর দেহে জ্বর আসে না।	iv. এ পর্যায়ে রোগীর দেহে কাঁপুনিসহ জ্বর আসে।
v. এ পর্যায়ে ক্রিপ্টোজয়েট, ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট নামক ধাপসমূহ দেখতে পাওয়া যায়।	v. এ পর্যায়ে ট্রফোজয়েট, সিগনেট রিং, সাইজন্ট ও মেরোজয়েট ধাপসমূহ দেখতে পাওয়া যায়।

▶ ম্যালেরিয়া পরজীবীর স্পোরোজয়েট ও ট্রফোজয়েট দশার মধ্যে পার্থক্য

স্পোরোজয়েট দশা	ট্রফোজয়েট দশা
i. স্পোরোজয়েট মশকীর লালাতে অবস্থান করে।	i. ট্রফোজয়েট মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থান করে।
ii. এদের দেহের এক প্রান্তে অ্যাপিক্যাল কমপ্লেক্স থাকে।	ii. দেহে কোনো অ্যাপিক্যাল কমপ্লেক্স থাকে না।
iii. স্পোরোজয়েটের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, খাদ্যগহ্বর ও ম্যাট্রিক্স গহ্বর থাকে না।	iii. এদের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, খাদ্যগহ্বর ও ম্যাট্রিক্স গহ্বর থাকে।
iv. সামান্য বাঁকানো কাস্তে আকৃতির অতিক্ষুদ্র পরজীবী।	iv. প্রায় গোলাকার অ্যামিবয়েড ধরনের পরজীবী।
v. দেহ দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক পেলিকল দ্বারা আবৃত।	v. দ্বিস্তরী প্লাজমা দ্বারা এদের দেহ আবৃত।
vi. মশকীর লালার সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে যকৃত কোষকে ভক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোকে ধ্বংস করে।	vi. এরা মানবদেহের লোহিত কণিকা ভক্ষণ করে সেগুলোকে ধ্বংস করে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাধ্যতামূলক পরজীবী বলা হয় নিচের কোন জীবকে?
ক. ছত্রাক খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. ভাইরাস ঘ. শৈবাল

২. ভাইরাস শব্দের অর্থ কী?
ক. ক্ষুদ্র খ. বিষ
গ. ধ্বংসকারী ঘ. খাদক

৩. ভাইরাসের দেহ কী দিয়ে গঠিত?
ক. নিউক্লিক অ্যাসিড
খ. প্রোটিন
গ. নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন
ঘ. কাইটিন

৪. কোথায় দ্বিসূত্রক RNA দেখা যায়?
ক. ব্যাকটেরিওফায খ. কলিফায
গ. রিওভাইরাস ঘ. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

৫. ভাইরাস এর প্রোটিন নির্মিত আবরণকে কী বলে?
ক. প্লাজমামেমব্রেন খ. কলার
গ. জিনোম ঘ. ক্যাপসিড

৬. অ্যান্টিবায়োটিক কাদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অক্ষম?
ক. ভাইরাস খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. ছত্রাক ঘ. শৈবাল

৭. 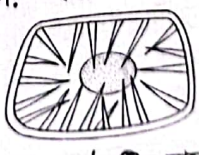
চিত্রের গঠনটির নাম কী?
ক. T_2-ফায খ. ভ্যাক্সিনিয়া
গ. TMV ঘ. পোলিও

৮. কোন ভাইরাসের আকৃতি পাউরুটির ন্যায়?
ক. T_2-ফায খ. পোলিও
গ. ভ্যাক্সিনিয়া ঘ. র‍্যাবডো ভাইরাস

CamScanner